নির্মলেরা খুন হচ্ছে

গৌতম রায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

দেবকুমার বসুকে

নির্মলেরা খুন হচ্ছে

হারানো
রহস্য

পুলিস অফিসার বিকাশ তালুকদার বললেন, 'জানেন মিঃ ব্যানার্জী, আমার জীবনে এ পর্যন্ত অনেক রকম কেস্ এসেছে। চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই এমনকি খুনও। চুরি ছিনতাই এগুলো মামুলি ব্যাপার। এগুলোর পাত্তা লাগাতে খুব একটা বেশিদিন সময় লাগে না। খুনের কেস্গুলো ভাবায়। অবশ্য সেগুলো মোটামুটি সলভড্ হয়ে যায়। কেউ সাজা পায়। কেউ পায় না। বুঝতেই তো পারছেন আইন যেমন আছে, আইনের ফাঁকও আছে। সেই ফাঁক ফোকর দিয়ে খুনী পালায়। চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কিছু করার থাকে না। সে সব ক্ষেত্রে নিজের মনে একটা স্যাটিস্ফ্যাকশান থাকে। খুনীকে তো আমি ট্রেস আউট করেছি। এখন আইন যদি তাকে বাঁধতে না পারে সে দোষ তো আমার নয়। কিন্তু দুঃখ বা মানসিক অশান্তি কোথায় জানেন?'

কথা বলতে শুরু করলে তালুকদার চট করে থামতে চান না। লোকটাকে ওর জানা বিষয় নিয়ে যদি বক্তৃতা দিতে বলা হয়—অনর্গল বলে যেতে পারেন। না থেমে অন্তত ঘণ্টা খানেক। যতক্ষণ না ওঁর গলা শুকোবে অথবা চোয়াল ব্যথা হবে।

বিকাশ তালুকদারের সামনেই বসে ছিল নীল ব্যানার্জী। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নীলাঞ্জন ব্যানার্জী। পরপর বেশ কিছু জটিল রহস্য সমাধান করার ফলে পুলিস মহলে ওর বেশ খাতির বেড়েছে। চোর ছ্যাঁচোড়ের কাছে ওর শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃসন্দেহে।

অবশ্য পুলিস মহলে সবাই যে নীলের ভক্ত তা নয়। ঈর্ষা তো থাকবেই। ওকে ঠিক সুনজরে দেখে না এমন অনেক অফিসারই আছেন। বিকাশ তালুকদার তাদের থেকে আলাদা। বিকাশ নিজে থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল। তারপর সেই আলাপ ক্রমশ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অবসর পেলেই বিকাশ নীলের বৈঠকখানায় এসে আড্ডা জমান। বেশির ভাগ কথাবার্তাই অপরাধী সংক্রান্ত। বিকাশের মধ্যে আত্মম্ভরিতা কম। খানিকটা খোলামেলা স্বভাবের। নিজের কৃতকার্য হওয়ার কথা যেমন ফলাও করে বলেন, ঠিক তেমনি পরাজয়ের বা অক্ষমতার কথা স্বীকার করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন না। বোধহয় সেই কারণেই নীল ওকে প্রশ্রয় দেয়। উনি তো স্পষ্টই বলেন, 'আমার এই মগজ নিয়ে খুব বেশিদুর এগুনো সম্ভব নয়। কিছুদুর এগিয়েই কেমন সব গুলিয়ে যায়। তখন মনে হয়

এ লাইনে না এলেই ভাল হত। ফার্টাইল ব্রেনম্যাটার না থাকলে পুলিসের চাকরি ছেড়ে অন্য কিছু করা দরকার। পুলিসে দরকার ব্রেনী লোক। যেমন আপনি।'

নীল ওকে থামিয়ে দিয়ে বলত, 'এ আপনার অতিবিনয় হয়ে যাচ্ছে তালুকদার। ভুলে যাবেন না আপনি একজন পুলিস অফিসার।'

ম্লান হেসে বিকাশ উত্তর দিতেন, 'প্রফেসারি করলে আমি কিন্তু অনেক বেশি সাইন করতাম।'

'তাহলে তাই করুন' হাসতে হাসতে নীল বলত।

'হবে না মশাই। শিং ভেঙে কী আর বাছুরের দলে ঢোকা যায়। বয়েস অনেকটা এগিয়ে গেছে।'

বিকাশ তালুকদারের দুঃখটা নীল বুঝত। বুঝত এই সরল মানুষটা সত্যিই প্যাঁচ-ট্যাঁচ তেমন জানে না। আসলে লোকটা খুবই নরম স্বভাবের। নীল লোকটাকে বেশ খোলা মনেই নিয়েছিল। নীলের বাড়িতে বিকাশের যাতায়াত ছিল অবাধ। নীল বাড়ি না থাকলে বেশ কিছুক্ষণ নীলের মায়ের সঙ্গে একদম ঘরোয়া সাংসারিক কথাবার্তা বলে চলে আসতেন। আজও তেমনি একটা দু'জনের সান্ধ্য আসরের আড্ডা বসেছিল। নীলের এখন হাত ফাঁকা। বেশ কয়েকদিন যাবৎ তেমন ভাল কোন মাথা ঘামানোর কাজ আসেনি। একা একাই দিন কাটাচ্ছিল। ওর, প্রিয় বন্ধু, কোন কোন সময় সহকারী, লেখক এবং প্রফেসর অজেয় বসু বেশ কিছুদিন যাবৎ কলকাতার বাইরে। একে হাত ফাঁকা, তায় প্রিয় বন্ধু কাছে নেই। বই, গান আর নিজের ব্যবসা নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল। বিকাশ আসতে ও একটু স্বস্তি পেয়েছিল।

বিকাশের খেদোক্তি শুনতে শুনতে নীলের মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই কোন একটি ব্যাপারে হীনমন্যতায় ভুগছে!

সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিতে দিতে নীল বলল, 'তা বর্তমানে আপনার মানসিক অশান্তির হেতুটা কি?'

'হেতু?' বলে বিকাশ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একমনে সিগারেট টানলেন। তারপর সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'চোখের সামনে খুন হল। সরেজমিনে তদন্ত হল। ফেলে যাওয়া সূত্র দেখে মনে হল খুন যে করেছে বা করতে পারে তাকে যেন চেনা যাচ্ছে। কিন্তু সে লোকটা এমন কোন সংকেত রেখে যায়নি, যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় লোকটা খুনী। তখন যে কী মানসিক অশান্তি হয় আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

মৃদু হেসে মাথা দোলাতে দোলাতে নীল বলল, 'তা বোধহয় হয় না। আমার

মনে হয় সে ক্ষেত্রে আপনার ইনভেস্টিগেশনটা ঠিক পথে চলছে না। হয়তো আপনার হিসেবে কোথাও ভুল হচ্ছে। কেন এরকম কোন ঘটনা ঘটেছে নাকি ?'

আবার বিকাশ খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে নীরব হয়ে রইলেন। তারপর কপাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'আজ থেকে বছর দেড়েক হবে। পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের একটা সফিসটিকেটেড ফ্ল্যাটে এক মহিলা খুন হন। তখন আমি ঐ অঞ্চলেই পোস্টেড। ন্যাচারালি কেসটা আমার হাতে আসে। আমার দিক থেকে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সলভ করতে পারিনি। অবশ্য এখন আমি অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেছি। ঠিক যাকে বলে দায়দায়িত্ব, সেটা আমার এখন নেই। কিন্তু ঐ যে বললাম, মনের খচখচানি সেটা আজও যায়নি। তখন মাঝে মাঝে মনে হত লোকটাকে মানে খুনীকে বোধহয় চিনতে পারছি, কিন্তু কোন প্রমাণ ছিল না। আজও নেই। হাত পা বাঁধা অবস্থায় মনের দুঃখ নিয়ে বসে আছি।'

'পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে ? বছর দেড়েক আগের ঘটনা ? কোন কেসটার কথা বলছেন বলুন তো ?'

'ওই যে, সেই শর্মিলা প্যাটেল বলে একটি বছর ছাব্বিশ-সাতাশের মেয়ে খুন হয়েছিল ··কাগজেও খুব লেখালেখি হয়েছিল সেইসময় ?'

'দাঁড়ান দাঁড়ান···বোধহয় মনে পড়েছে, শর্মিলা মার্ডার ? সো ফার আই ক্যান রিমেম্বার, মেয়েটি ঠিক ভদ্রভাবে জীবনযাপন করত না।'

'ইয়েস, আপনি ঠিকই ধরেছেন। মেয়েটি বোধহয় কারো রক্ষিতা ছিল। সেটাও অবশ্য সঠিক কিনা জানি না। তবে সোজাসুজি বলতে গেলে বলা যায় শর্মিলা ঠিক ভদ্র জীবনযাপন করত না। অথচ মেয়েটি ছিল বিবাহিতা।'

'হাতে তো এখন সময় আছে।'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?'

'আমারও সময় আছে। চা আর তেলেভাজার অর্ডার দিচ্ছি। এবার বেশ গুছিয়ে বলুন তো আপনার শর্মিলা হত্যাকাণ্ড।'

নীল উঠে গিয়ে দীনুকে তেলেভাজা আর চায়ের ফরমাশ করে এসে জমিয়ে বসল। পৌষের শীত। সন্ধ্যে হতে না হতেই প্রায় কনকনে ভাব। শালটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে নীল সোফার মধ্যে প্রায় সেঁদিয়ে গেল। বিকাশের গায়ে পুলিসি ধরাচূড়ো। একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিকাশ আরম্ভ করলেন ওর স্মৃতিচারণ।

'সেদিন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। সকাল থেকেই টিপটিপে ছিল। বিকেলের পরই

নামল মুষলধারে। থানাতেই ছিলাম। রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা কি পৌনে দশটা। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। থানায় ফোন আসা মানেই ব্যাপারটা সুবিধার নয়। লোকে থানায় ফোন করে বিপদে পড়লে। মুখটা স্বাভাবিক কারণেই ব্যাজার হয়ে উঠেছিল। কারণ মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে কোনমতেই বেরতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু ডিউটিতে ছিলাম। ফোন তুলতেই হল। ওপাশ থেকে ভেসে এল একটি পুরুষ কণ্ঠ। জানাল, পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের একটি মাঝারি ধরনের ১২ নম্বর ফ্ল্যাটে একটি মেয়ে খুন হয়েছে।'

'এক সেকেণ্ড', বলে নীল বিকাশকে বাধা দিল, 'যে লোকটি ফোন করছিল সে কে ?'

'এও এক মজার ব্যাপার। পরে আমি অনেকবারই জানার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কে যে ফোন করেছিল তা জানতে পারিনি।'

'লোকটার গলার আওয়াজ, আই মীন, কথাবার্তায় ঠিক কী ধরনের লোক বলে মনে হয় ?'

'তেমন বিশেষ কিছু কথা তো হয়নি। খুবই অল্প কথায় সে তার বক্তব্য শেষ করেছিল। তবে ঐটুকু সময়ের মধ্যে যা বোঝা গিয়েছিল, তা হচ্ছে, লোকটির গলার আওয়াজ ছিল খ্যানখেনে টাইপ, আর ভাষাটাষাও খুব পরিশীলিত নয়। কোথায় যেন একটু অশিক্ষিত অবাঙালী টান—ঠিক বলে বোঝাতে পারছি না—'

'ঠিক আছে, তারপর কী হল ?'

'জনাতিনেক কনস্টেবল আর একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে ঠিকানা মত নির্দিষ্ট বাড়িতে পৌছলাম। বাড়িটা ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাড়া দেওয়া হয়। তখন প্রায় সাড়ে দশটা। এমনিতেই ওই এলাকাটা নির্জন থাকে। তার ওপর বৃষ্টি এবং বেশ রাত। আশেপাশে তেমন লোকজন কাউকে দেখা গেল না। একটু দূরে দু'একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল।

'জায়গাটা চিনতে অসুবিধা হল না। আমাদের ভাষায় পশ রেডলাইট জোন। সমাজের নামী দামী মানুষেরা এখানে স্ফূর্তিটুর্তি করতে আসেন। আর যেসব মেয়েরা সেই বাড়িতে অ্যাপার্টমেণ্ট নিয়ে থাকে তাদের জীবনযাত্রাও স্বাভাবিক নয়।

'যাই হোক প্রথমেই কেয়ারটেকারের খোঁজ নিলাম। সে বেটা তো কোনা রকমে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। পুলিশ টুলিস দেখে তার নেশা বোধ হয় সাময়িক ফিকে হয়ে গিয়েছিল। খুনের কথা ওকে জিজ্ঞেস করতে ও তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ল। তারপর লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম বারো নম্বর ফ্ল্যাটে

'ফ্ল্যাটের দরজা কিন্তু লক করাই ছিল। বেল টিপতে কোনো সাড়াশব্দ

গেলুম না। শেষমেশ তালা ভেঙে ঢুকতে হল। সাজানো গোছানো সুদৃশ্য ছিমছাম ফ্ল্যাট। আলো টালো জ্বালানোই ছিল। ডাইনিং স্পেসে কাউকে পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে গেলাম। প্রথম ডাইনে যে ঘরটা পড়ে সেটাই বেডরুম। নিভাঁজ বিছানায় ধবধবে সাদা চাদর পাতা। বেশ বোঝা যায় সন্ধ্যে থেকে সেটি ব্যবহৃত হয়নি। অবশ্য মৃতদেহ পাওয়া গেল ঐ ঘরেই। ওয়ার্ডোবের ঠিক পাশেই। উপুড় অবস্থায় পড়ে ছিল। সারা পিঠ জুড়ে রক্তের চাপ।

'মৃতা মহিলা বেশ সুন্দরী। বয়েস ছাব্বিশ সাতাশের মধ্যে। টকটকে গায়ের রঙ। একটু মড টাইপ। বয়েজ-কাট করা চুল। গায়ে ছিল হাউসকোট। পি. এম. রিপোর্টে পাওয়া যায় মহিলাকে পেছন থেকে ক্লোজ রেঞ্জে দাঁড়িয়ে গুলি করা হয়। এক গুলিতেই শেষ। মৃতার স্টমাকে অ্যালকোহলও ছিল।'

ইতিমধ্যে দীনু তেলেভাজা আর চা দিয়ে গিয়েছিল। একটা গরম বেগুনী তুলে নিয়ে নীল বলল, 'তালুকদার, এবার আর ডেসক্রিপশান নয়। আমি প্রশ্ন করব, আপনি মনে করে করে ঠিক জবাব দিন।'

তালুকদার একটা বেগুনী তুলে নিয়ে বলল, 'কেন ব্যানার্জী, আমি কি ঠিক মত বলতে পারছিলুম না।'

নীল হেসে বলল, 'আরে তা নয়, প্রথমত মুখে গরম তেলেভাজা নিয়ে এক নাগাড়ে কথা বলা যায় না। দ্বিতীয়ত আমি খুঁটে খুঁটে দরকারী পয়েন্টস্‌গুলো তুলে নিতে চাই। এতে দু'পক্ষেরই সুবিধে। আচ্ছা প্রথমে বলুন, মৃতার নাম?'

'শর্মিলা প্যাটেল।'

'মানে বাঙালি নয়। দেখতে সুন্দরী। মদ্যপান করত। আচ্ছা, দেহের আর কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল কি?'

'না, এক গুলিতেই সাবাড়। হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড়।'

'মৃতার আত্মীয়স্বজন?'

'এও আর এক গোলমেলে ব্যাপার। তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে ঐ বাড়িরই একজন জানায়, ওর নাকি স্বামী বলে কেউ একজন আছে। অবশ্য সে কখনও সখনোও আসত। তার কোনো ঠিকানা পাওয়া যায়নি।'

'কখনও সখনোও আসত মানে?'

'কেয়ারটেকারের মুখে যা শুনেছি আর কি! মাঝে মাঝে মদ্যপান করে লোকটা আসত। কিছু হামলাবাজি করত। তারপর শর্মিলা দেবীর উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে করতে বেরিয়ে যেত।'

'তার মানে শর্মিলাকে একাই থাকতে হতো। আচ্ছা ফ্ল্যাটটা কার নামে নেওয়া ছিল ?'

'রমা প্যাটেল।'

'সে আবার কে ?'

'শর্মিলার মা। আবার কেউ কেউ বলে মা ফা কিছু না। ওটা শর্মিলারই আসল নাম। ওদের ঐ প্রোফেশনে নাকি একটা ভাল নাম টাম নিতে হয়। তবে শর্মিলা নাকি একাই থাকত।'

'চলত কী করে ? ও-াব জায়গায় ফ্ল্যাট ভাড়াওতো প্রচুর।'

'তাতে কী ? শর্মিলার যা রূপের বহর দেখেছিলুম, তাতে করে পয়সার অভাব হবার কথা নয়। মাঝে মাঝেই নাকি ওর ঘরে নিত্যনতুন লোকের ভিড় হতো। শোনা যায় কিছু ছবিতেও নাকি নেমেছিল। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, খুন হবার প্রায় বছর দেড়েক আগে শর্মিলা প্যাটেলের কাছে একজন ভদ্রলোকেরই নিয়মিত যাতায়াত ছিল।'

নীল এবার একটু নড়েচড়ে বসল। চায়ের কাপে আলতো করে চুমুক দিয়ে বলল, 'এই 'একজন' লোকটি কে ?'

'কেউই বলতে পারল না। সপ্তাহে তিন চারদিন তিনি আসতেনই। কোনো কোনো উইকে রোববার বাদ দিয়ে সবদিনই। প্রায় রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ওখানে কাটিয়ে ফিরে যেতেন।'

'তার মানে ঐ লোকটাই শর্মিলার সর্বশেষ বাবু ? তার কোনো হদিশ পাননি ?'

'না। আসতেন ট্যাক্সিতে ফিরতেন সেই ট্যাক্সিতেই ?'

'মানে কণ্ট্রাক্টে ভাড়া করা গাড়ি। তা সেই ট্যাক্সির খোঁজ করেছিলেন ?'

'করব না মানে ? এর জন্যে স্পেশাল আই. বি. পর্যন্ত ডেপুট করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো খোঁজই নেই। আসলে কে আর সাধ করে খুনের কেসে জড়াতে চায়।'

'ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দাদের মনোভাব কি ছিল, মানে শর্মিলা সম্বন্ধে ?'

'মুখ কেউই খুলতে চায়নি। আসলে ফ্ল্যাটে যা হয়। একই ছাদের তলায় থেকেও কেউ কারো খবরে উৎসাহী হয় না। অবশ্য একজনের মুখে শোনা গেল শর্মিলা নাকি খুব দেমাকি ছিল। কারো সঙ্গে তেমন মেলামেশা করত না। সর্বদাই একটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করত। ফলে কেউই আর তার সম্বন্ধে খোঁজ রাখত না।'

'হুঁ,' বলে নীল বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর এক সময়

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, 'সেদিন খুনটা হয়েছিল কখন? মানে পি. এম. রিপোর্ট কী বলে?'

'বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটার মধ্যে যে কোনো সময়েই হতে পারে।'

'সেদিন ঐ সময়ে শর্মিলার ঘরে কে গিয়েছিল? কেয়ারটেকার কিছু জানে?'

'না। কারণ সারাদিনই বৃষ্টি পড়ছিল। আর কার ঘরে কে আসছে বা যাচ্ছে তার খোঁজ রাখার কথা তার নয়—মানে এটাই ছিল তার বক্তব্য।'

'শর্মিলার বডি রিলিজ করতে কেউ এসেছিল?'

'না। বাকী কাজটা পুলিসই করে।'

'ওর ঘর থেকেও ওর সেই বাবুটির কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি? মানে কোনো সূত্র টুত্র?'

সাধারণত যারা রক্ষিতা রাখে, তাদের বেশীরভাগ লোকেরই একটা সংসার থাকে। এবং স্বাভাবিক কারণেই রক্ষিতাব কথা সে বাড়িতে গোপন রাখতেই চাইবে। ন্যাচার‍্যালি সে তার রক্ষিতার ঘবে নিজের কোনো আইডেন্টিটি রাখবে না বা রাখতে চাইবে না। এ ক্ষেত্রেও ছিল না, অবশ্য বেডরুমে প্রচুর ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছিল। মানে বাইরে থেকে নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল।'

'অর্থাৎ সব দিক থেকেই রাস্তা বন্ধ করে রেখেছেন। স্বামী নামক ব্যক্তিটির সন্ধান নেই। নাগরটিও বেমালুম নিপাত্তা। ট্যাক্সিওলাটাকেও পেলে কাজে দিত। সেও চুপচাপ। খুনের মোটিভ কিছু পেয়েছিলেন?'

'সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যা হয়, দু'নাগরে বিবাদ, মরে মক্ষীরানী, নয়তো তহবিল তছরূপ। তা বাক্স পেটরা ভাঙা হয়নি। আলমারিতে চাবি দেওয়াই ছিল। আর মোটামুটি টাকা পয়সা গয়নাগাটি ঠিক ছিল, মনে হয় ঠিকই ছিল। পাশবুকটাও পাওয়া গিয়েছিল। ব্যাঙ্কে হাজার বিশেক টাকা পড়েছিল।'

'অর্থাৎ মোটিভটাও ধোঁয়াটে।'

'কী মনে হয় ব্যানার্জী? এ কেস কোনোদিনও সলভ্ হবে? আমার তো মনে হয় এর থেকে সহজ হবে মহেঞ্জোদাড়োর মাটি খুঁড়ে কিছু আবিষ্কার করা।'

নীল কিছু না বলে চোখে বুজে বসে রইল। খানিকক্ষণ উশখুশ করে বিকাশ বললেন, 'আমি জানি. এ কেস কোনো দিনও মীমাংসায় আসবে না। পৃথিবীতে বহু খুনের কেস আনসলভ্ড রয়ে গেছে। এটাও তাই হবে। কারো কিছু এসেও যাবে না। যদ্দুর মনে হয় এই বারবণিতার জন্য কাঁদার বা দুঃখ করার তেমন কোনো লোক নেই। থাকলেও তাদের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু একজন পুলিস অফিসার হিসেবে আমার দুঃখ রয়ে গেছে। চেষ্টা করেও আমি পারিনি।

একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যেতে হয়েছে। তারপর বদলি। এখন সবই ধামাচাপা। আমার ডায়েরীতে অবশ্য লিখে রেখেছি, 'অ্যান আনসলভড কেস।'

সে রাত্রে আর কোনো কথা হল না। এক সময় বিকাশ চলে গেলেন। নীল অনেকক্ষণ নির্জীবের মত সোফায় বসে কাটিয়ে দিল।

সবুজ রঙের চকচকে মারুতির পিছনের সিটে বসে থাকা লোকটাকে দেখে চমকে উঠল সোহনলাল। হ্যাঁ, এইতো সেই। দেড় বছর হল এই লোকটাকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। লাইটপোস্টের নিওন আলোটা সরাসরি এসে পড়েছে গাড়ির ওপরে। গাড়ির ভেতরেও যে আলো ছিটকে পড়ছে তাতে লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না সোহনলালের। সেই টকটকে রঙ। উদ্ধত কপাল। তীক্ষ্ণ নাক। পাতলা ঠোঁট আর দৃঢ় চিবুক। এই দেড় বছরে একটুও পাল্টায়নি। কোঁচকানো ব্যাকব্রাশ করা চুল। দেড় বছর আগে এই লোকটাকে সে অনেক, অনেকবার দেখেছে। কখনও কাছ থেকে, কখনও দূর থেকে। অবশ্য লোকটা তাকে চেনে না। সেও তার পরিচয় জানে না। জানার কোনো দরকারও সেদিন ছিল না। তার দরকার ছিল টাকার। মাসের মধ্যে দু'তিনবার বা অন্য কোনো দরকারের সময় গিয়ে হাজির হতো পার্ক স্ট্রীটের সেই ফ্ল্যাটে। যে ফ্ল্যাটে থাকত শর্মিলা প্যাটেল। তার বিয়ে করা বউ। আসল নাম রমা প্যাটেল। শর্মিলা ওর পোশাকী নাম।

বউ টউ নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা তার কোনো দিনও ছিল না। বউ মানে একটা মেয়েছেলের শরীর। পকেটে পয়সা টয়সা থাকলে অমন শরীর অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু যেটা পাওয়া যায় না ইচ্ছেমত, সেটা হল টাকা। আর সেই টাকা রোজগারের সুযোগটা এসে গিয়েছিল হাতের মুঠোয়। শর্মিলাই ছিল তার মুঠো মুঠো টাকা কামানোর কামধেনু।

সোহনলালের মনে হয় অমন একটা ডাকসাইটে সুন্দরী বউ থাকলে টাকা কামানোর অভাব হয় না। মিষ্টি ফুলের চারপাশে যেমন মৌমাছিরা ভিড় করে, ঠিক তেমনি ত্বার বউটার পাশে শহরের আচ্ছা আচ্ছা তালেবর ধনীরা ভিড় জমাতো। সে নিজেই এগিয়ে দিত শর্মিলাকে ওদের কাছে। যদিও প্রথম প্রথম শর্মিলা অনেক আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু টাকায় বোধহয় সব সহ্য হয়ে

যায়। শর্মিলারও হয়েছিল।

এই লোকটাই, হ্যাঁ এই লোকটাই ছিল শর্মিলার বাঁধা বাবু।

কিসের যেন একটা মিছিল-টিছিল বেরিয়েছে। গাড়িগুলো জ্যামে আটকে গেছে। সবুজ মারুতিও আটকেছে। আর আটকেছে বলেই দেড় বছর ধরে খুঁজতে থাকা লোকটাকে, এখন এই টলায়মান মস্তিষ্কেও খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না সোহনলালের।

শর্মিলার মুখেই শোনা ছিল, লোকটার নাকি দেদার টাকা। মস্তবড় একটা কোম্পানির মালিক। তা হোক। যত মালদার পার্টি আসে ততই সোহনলালের মোচ্ছব। তার দরকার টাকার। বিনা পরিশ্রমে চাই টাকা। আর টাকা না পেলে তার স্ফূর্তি জমবে কেমন করে? নিত্য নেশার জোগান, সেও তো টাকার বদলেই!

দিন চলছিল এমনি করেই। কিন্তু চলল না। দেড় বছর আগের এক বীভৎস বৃষ্টি ঝরা রাতে সব শেষ হয়ে গেল। রমা মানে শর্মিলা খুন হল। তার সুখের সিন্দুক যেন এক নিমেষে কেউ লুঠ করে নিয়ে গেল। সেই রাতটার কথা আজও মনে আছে।

সারাদিন ধরেই বৃষ্টি পড়ছিল। শেষ বিকেলে নামল আরো জোরে। জুয়োর আড্ডা থেকে যখন সে উঠে এল দেখল ঘড়িতে বাজে রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। আর পকেটও কপর্দকহীন। ঠিক সেই মুহূর্তে টাকা না হলে চলবে না। টাকা না হলে এমন বৃষ্টি ঝরা রাতটাই মাটি! পেটে দু'পাত্তর না পড়লে জগৎ-সংসার ম্যাড়মেড়ে। ভিজে জবজবে অবস্থায় যখন সে ফ্ল্যাটবাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল তখন বৃষ্টির তোড় আরো বেড়েছে। মেঘলা রাতের মোষ-কালো অন্ধকার আর বৃষ্টির ঝাপটায় ফ্ল্যাটবাড়ির সামনেটা কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছিল। সবটাই আবছা আবছা। ঠিক তখনই ওর মনে হয়েছিল, কে যেন একটা লোক ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়েই ছুটে চলে গেল রাস্তার অপর ফুটে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সির সামনে। সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সির দরজা খুলে গেল। লোকটা ভেতরে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি স্টার্ট নিল। তারপর নিমেষে ট্যাক্সি উধাও।

ঘটনাটা ঘটতে পুরো ষাট সেকেণ্ড লাগেনি। কেমন যেন ধন্দে পড়েছিল সোহনলাল। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে লোকটা ভিজতে ভিজতে বেরিয়ে এল। এসেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল। তারপরই ট্যাক্সি প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল। কে জানে, লোকটা পাগল না অন্য কোনো মতলবে এসেছিল? এদিকে সেও ভিজছিল। আর ফালতু কিছু অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিও তার ছিল না। কে কার

ঝাড়ের বাঁশ কাটছে তার কি দরকার ? যে দরকারে তার আসা সেটা হলেই হল

মুখের ওপর ঝরে পড়া বৃষ্টির জল সরাতে সরাতে সে যেই ম্যানসানটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখনই আরো একটা কাণ্ড ঘটল। প্রায় মাঝ বয়েসী একটা লোক, উদ্‌ভ্রান্তের মত সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে তার মুখোমুখি। ভালো করে কিছু ঠাহর করার আগেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে লোকটা উন্মত্তের মত ছুটে বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় নেমে গেল। সোহনলালের অশক্ত শরীর সে বেগ সহ্য না করে মাটিতে পড়ে গেল—। 'শালে বাইনচোত' বলতে বলতে সোহন-লাল যখন উঠে দাঁড়াল লোকটা তখন দৃষ্টির বাইরে।

সোহনলাল আরো একবার পুরনো শব্দটা উচ্চারণ করে মনের সাধ মিটিয়ে প্রায় অস্থির পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল।

বারো নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে সে বেল টিপল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পেলো না। মনে মনে তখন সে হেসেছিল। রমা প্যাটেল এখন বাবু নিয়ে ব্যস্ত। ডাকলেই কী আর সাড়া পাওয়া যায়! মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে আবার বেল টিপল। না কোনো সাড়া নেই। এরপর অনেকক্ষণ ধরে বেলে হাত টিপে দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য, কেউ কিন্তু দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে এল না। তবে কি রমা ঘুমিয়ে পড়েছে? কিন্তু, তাই বা কেমন করে হয়? এখন তো সবে সাড়ে সাতটা। রমার এখন সন্ধ্যেই হয়নি। বাঁধা বাবুটি যদি এসে থাকে তাহলে অন্তত সাড়ে ন'টার আগে সে ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবে না। বাবুটি এ ব্যাপারে বেশ স্যায়না। নির্দিষ্ট সময়ের পর আর কিছুতেই সে রক্ষিতার ঘরে থাকবে না। রমার মুখেই শোনা, রাতে বাবুকে বাড়ি ফিরতেই হবে। নইলে ঘরের জেনানাটির কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।

আরো বেশ কয়েকবার বেল টেপার পর, কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে নেমে এল নিচে। কেয়ারটেকারের কাছে। সে বেটা তখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসেছে বোতল নিয়ে। বেশ বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেই সোহনলাল তাকে সব খুলে বলল। বলল, অনেকক্ষণ বেল টিপেও বারো নম্বরে কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছে না।

লোকটা যেতে চাইছিল না। অনেক কাকুতির পর লোকটাকে নিয়ে ও বারো নম্বরে হাজির হল।

বহু ধাক্কাধাক্কির পরও যখন কোনো সাড়াশব্দ মিলল না, তখন বাধ্য হয়েই, তাকে মাস্টার-কী দিয়ে দরজা খুলতে হল। আর তারপরেই আবিষ্কৃত হল রমা প্যাটেল ওরফে শর্মিলা প্যাটেলের মৃতদেহ। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে ওয়ার্ডোবের পাশে।

সেই মুহূর্তেই সোহনলালের চোখের সামনে দুলে উঠেছিল সারা পৃথিবী। না, রমা প্যাটেলের জন্যে তার কোনো শোকটোক ছিল না। মায়া মমতা ঈর্ষা কোনো কিছুই না। তার তখন কেবল একটা কথাই মনে হয়েছিল, তার সোনায় ভরা সিন্দুকটা কে যেন লুঠ করে নিয়ে গেছে।

পুলিস টুলিস আসার আগেই সোহনলাল পালিয়েছিল। পুলিশের হ্যাপায় পড়তে তার বিন্দুবিসর্গ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার মনে বিদ্যুতের চমকের মত একটি ঝিলিক মাথার মধ্যে খেলে গিয়েছিল। রমা প্যাটেল খুন হয়েছে। এবং পরপর দুটি লোক দ্রুতবেগে, মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই পালিয়েছে। লোক দুটির একজন কে হতে পারে তা সে নিমেষেই বুঝে নিয়েছিল। রমার সেই শাঁসালো বাবুটি। কিন্তু আর একজন কে? রমার অন্য কোন বাবু? কে জানে!

তারপর দেড় বছর কেটে গেছে। দেড় বছর সে খুঁজছে রমার সেই বাবুটিকে, যাকে সে আগে অনেকবারই দেখেছে। এই সেই লোক। এখন নিশ্চিন্ত আরামে মারুতির মধ্যে বসে আছে। ঐ লোকটার মুখ দেখলে এখন কিছুতেই বোঝা যাবে না, দেড় বছর আগের এক সন্ধ্যায় সে তার রক্ষিতাকে খুন করেছিল।

অথচ এই দেড় বছরে, সোহনলাল ক্রমাগত দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। রমা প্যাটেলের মৃত্যুর পর তার অবস্থা হয়েছে আরো করুণ। আরো নিশ্চল। রমা প্যাটেলের টাকা পয়সা, গয়নাগাটি, কোনো কিছুই সে হাতাতে পারেনি। সে রাত্রে কেয়ারটেকার না থাকলে অবশ্য টাকা গয়না যা তার আলমারিতে ছিল, সবই নিয়ে সরে পড়তে পারত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ ফ্ল্যাটের চাবি তার কাছে থাকত না। থানায় গিয়ে সে নিজেকে রমার স্বামী বলে পরিচয় দিতে পারেনি। পুলিসি ঝামেলায় পড়তে সে কোনোদিনও উৎসাহী নয়।

এখন এই বাংলা মদের চুরচুরে অবস্থায়, জীর্ণ দেহ, শীর্ণবাস টলায়মান নিজেকে দেখতে দেখতে এক অজানিত পুলকে শিহরিত হয়ে উঠল সোহনলাল। পেয়েছে। দেড় বছর আগের পলাতক খুনীর দেখা সে পেয়েছে।

হঠাৎ উত্তেজনায় সোহনের নেশার মেজাজ বোধহয় কিছুটা ফিকে হয়েছিল। চিরদিন পরের মাথায় হাত বুলিয়ে, অথবা নিজের স্ত্রীকে পাপপথে নামিয়ে, কোনো কাজকর্ম না করে আরামে দিন কাটানোই তার জীবনদর্শন। আর সেই জীবনদর্শনের মধ্যেই সহসা সোহন খুঁজে পেল একটি লোভনীয় ইঙ্গিত। আজ যখন সে বাবুটিকে পেয়েছে হাতের নাগালে, তখন এ নাগাল ছিঁড়ে কিছুতেই সে তাকে পালাতে দেবে না। এ যে সোনার খনি। একে হাতছাড়া করা যায়?

যার জন্যে তার জীবনের সব সুখের ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছিল, সেই ঠিকানা তাকে ফিরে পেতেই হবে।

ঘোষ কেমিক্যালসের ওয়ার্কিং পার্টনার ও ডিরেক্টর রামানন্দ বসুর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কিছু কানাঘুষো শোনা গেলেও তিনি কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্রে ছিলেন প্রচণ্ড রকমের নিয়মশৃঙ্খলা মানা লোক। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় তাঁর চলার অভ্যেস। ব্যবসা বা অফিসসংক্রান্ত ব্যাপারে পান থেকে চুন খসা তিনি পছন্দ করেন না। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অফিসে এসে নিজের চেম্বারে ঢোকেন। কর্মচারীদের উপস্থিতির ব্যাপারেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি। হাজিরার খাতাটা থাকে তাঁর নিজের ঘরেই। নিজের চেয়ারে বসে প্রথমেই তিনি টেনে নেবেন হাজিরার খাতাখানা। কোনোরকম লাল কালির আঁচড় টাঁচড় দেবার পক্ষপাতী তিনি নন। কেবল তিনি চোখ বুলিয়ে দেখে নেবেন সবাই ঠিকমত এসেছেন কিনা। কোনো কর্মচারী যদি পরপর তিনদিন দেরীতে অফিসে আসে, মুখে তিনি তাকে কিছুই বলবেন না—কেবল তাকিয়ে থাকবেন তার দিকে, যতক্ষণ না সে সই শেষ করে নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। তারপর, একই ব্যক্তি তিনদিন পরপর লেট হলেই রামানন্দ বসুর সই করা, কেন দেরী হচ্ছে তার জবাব চাওয়া চিঠি যাবে। চিঠির উত্তর সন্তোষজনক না হলেই কোম্পানীর তরফ থেকে ফরমান জারী হবে, এই ধরনের ঘটনা পুনরায় ঘটলে তার ইনক্রিমেণ্টের ব্যাপারে কোম্পানী নতুন করে ভাবতে শুরু করবে।

ঘোষ কেমিক্যালসের বেতন খুবই চড়া। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও প্রচুর। বলতে গেলে আজকের দিনে এত ভাল মাইনে খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। বাৎসরিক ইনক্রিমেণ্টের হারও খুব ভাল। অতএব কেই বা চাইবে বছর শেষে নিজের আখেরের ক্ষতি!

রামানন্দ কিন্তু সত্যিই কাজে গাফিলতি পছন্দ করেন না। কোনোদিনও করতেন না। আর সেই জন্যেই ঘোষ কেমিক্যালসের একজন সাধারণ কর্মচারী থেকে নিজের দক্ষতা আর সততায় হয়েছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তারপর ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন ওপরে। হয়েছেন কোম্পানির ডিরেক্টর এবং ওয়ার্কিং পার্টনার।

অবশ্য ওয়ার্কিং পার্টনার হবার পিছনে অন্য ইতিহাস। এ ইতিহাস সবাই

জানে। বিশেষ করে যাঁরা একদিন তাঁর সহকর্মী ছিলেন এবং আজ সময়ের ফেরে তাঁরা তাঁর অধস্তন কর্মচারী মাত্র।

এ কাহিনীতে রামানন্দের ভূমিকা অনেকখানি। তাই তাঁর অতীত ইতিহাস আমাদের জানা দরকার।

রামানন্দ যেদিন প্রথম ঘোষ কেমিক্যালে আসেন তখন তাঁর বয়েস নিতান্তই অল্প। সবেমাত্র বি. এস-সি. পাশ করেছেন। পড়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আর বেশীদূর তখন এগুনো সম্ভব হয়নি। সেই মুহূর্তে তাঁর চাকরির বড় দরকার ছিল। যদিও সংসারে তাঁর তখন বন্ধন একমাত্র বুড়ি মা। কিন্তু সামান্য কিছু টিউশনি করে নিজের লেখাপড়া, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা এবং সংসার খরচ, কোনো মতেই সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়েই চাকরির চেষ্টা শুরু করতে হল।

অবশ্য বেশীদিন ঘোরাঘুরি করতে হয়নি। খানকতক আবেদনপত্র পাঠাবার পরই ডাক এসেছিল ঘোষ কেমিক্যালস্ থেকে।

রামানন্দ লোকটি ছিলেন অতীব সুদর্শন এবং সুপুরুষ। তদুপরি মোটামুটি শিক্ষিত। ঘোষ কেমিক্যালসের মালিক ভবেশ ঘোষ প্রথম দর্শনেই রামানন্দর প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন। তারপর মোটামুটি পরীক্ষা করার পর তিনি রামানন্দকে ভাল মাইনে দিয়েই বহাল করেছিলেন।

প্রথম দর্শনের পর এসেছিল গুণের বিচার। আগেই বলেছি, রামানন্দ ছিলেন সৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ। ফাঁকী জিনিসটা তাঁর চরিত্রেই ছিল না। নির্বিবাদী, কর্তব্যপরায়ণ রামানন্দ খুব অল্পদিনের মধ্যেই ভবেশের সুনজরে চলে এলেন। ফলে তাঁর পদোন্নতি তো ঘটলই, ক্রমশ তিনি ভবেশের দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠলেন।

রামানন্দের উন্নতিতে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ঈর্ষার ভাব দেখা দিলেও, কারো কিছু করার ছিল না। কারণ রামানন্দের ততদিনে কেবল অফিস নয়, ভবেশের বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই অফিসের কাজকর্ম মিটলে রামানন্দ ভবেশের সঙ্গে একই গাড়িতে ফিরতেন। যেতেন ভবেশের বাড়ি।

যদিও জল্পনা কল্পনার শেষ ছিল না। কিন্তু প্রবীণ কর্মচারীরা মোটামুটি যে ব্যাপারটি আঁচ করে মুখরোচক গল্পের বুনন শুরু করেছিলেন, অচিরেই সেটাই সত্য হয়ে উঠল। এবং এ নিয়ে বেশ কিছুদিন রামানন্দর অসাক্ষাতেও রসাল কাহিনী পরিবেশিত হয়ে চলল।

শিবানী ঘোষ। ভবেশ ঘোষের কন্যা। কিন্তু এই ধনী তনয়াটিকে নিয়ে ভবেশের চিন্তার অন্ত ছিল না। ভবেশ ঘোষের যা অর্থ ছিল তা দিয়ে শিবানীর কয়েক পুরুষ বসে খাবার কথা। কিন্তু অর্থই তো সব নয়। যদিও শিবানী

শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, ভবেশের অবর্তমানে ঘোষ কেমিক্যালস্ চালাবার মত মানসিকতা এবং শিক্ষা দীক্ষা তার আছে, তবুও শিবানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবেশ ছিলেন অতিমাত্রায় শঙ্কাতুর। কারণটি ফেলে দেবার মত নয়।

শিবানী তখন পূর্ণ যুবতী। কিন্তু কোনো পুরুষকে মুগ্ধ করার মত কিছুই ছিল না তার। বড়লোকের গোলগাল সন্তান। যদিও তার গায়ের রঙ ধবধবে সাদা, মাথায় অজস্র চুল, মুখটিও নেহাৎ খারাপ নয়, কিন্তু শরীরের চর্বি তরঙ্গ তাকে ক্রমাগত এমন জায়গায় এনে ফেলেছিল, যা অকল্পনীয়। লোকে সাক্ষাতে কিছু বলার সাহস পেতো না। কারণ ভবেশ ঘোষ ধনী। শিবানী ঘোষ তাঁর একমাত্র কন্যা। পরবর্তী মালকিন। কিন্তু ভবেশের আড়ালে শিবানীর নামকরণ হয়েছিল 'সাদা হাতি'। হয়তো কোনোদিন শিবানীর মুখে কোনো কারুমিতির ছাপ ছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক মেদবৃদ্ধি তার মুখের সব সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে তাকে একটি বিশালাকার ফুটবলে রূপান্তরিত করেছিল।

ভবেশ যেদিন প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন রামানন্দ সেদিন রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। ভবেশের খাতির, যত্ন, আতিথেয়তা এবং অতি স্নেহপ্রবণতার অন্তর্নিহিত কারণটি সেদিন রামানন্দের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বুঝতে অসুবিধা হয়নি কেন সমযোগ্যতা সম্পন্ন অন্য প্রার্থীদের নাকচ করে ভবেশ তাঁকে নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয়নি কেন তাঁর দিন দিন কর্মোন্নতি, কেন তাঁর মাহিনা আর সবার থেকে অনেক বেশী। কেন অতি অল্পদিনের মধ্যেই সামান্য কর্মচারী থেকে ম্যানেজারের পদে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সব বুঝেও রামানন্দ মুখে রা কাড়েননি। তাঁর সামনে তখন দুটো রাস্তাই খোলা ছিল। হয় ভবেশের ইচ্ছেকে সম্মান দেওয়া নয়তো এমন সুখের চাকরিতে ইস্তফা টানা। এবং চাকরি ছাড়ার অর্থ আবার সেই পুরনো দিনকে ফিরিয়ে আনা।

রামানন্দ অবশ্য নিজে থেকে কিছুই করলেন না। কারণ কোনো ব্যাপারেই রামানন্দ কোনো প্রতিবাদ জানাতেন না। ভবেশও সেটা বুঝতেন। তারপর একদিন সরাসরি শিবানীকে বিয়ে করার প্রস্তাব রাখলেন।

এবারও রামানন্দর কোনো প্রতিবাদ নেই। কারণ রামানন্দ জানতেন শিবানীকে বিয়ে করলে তাঁর জীবনের একটা দিক যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে, ঠিক তেমনি অন্য আরেক দিক খুলে যাবে। শিবানী ভবেশের একমাত্র ওয়ারিশন। অতএব একদিন ঘোষ কেমিক্যালসের পরবর্তী মালিক হবেন রামানন্দ বসু।

খুব ধুমধাম করেই বিয়েটা হয়েছিল।

কিন্তু বিয়ের পরই রামানন্দের ভুল ভাঙল। শ্বেত হস্তিনীকে যতটা নিরেট বলে তিনি ভেবেছিলেন শিবানী কিন্তু তা নয়। প্রথম চমক লাগল বিয়ের রাত্রে।

সাধারণত বিয়ের রাতে নববধূকে লজ্জাবনত অবস্থায় পাওয়া যায়। রামানন্দও তাই আশা করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্যরকম।

রামানন্দ তখন ঘরের একদিকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন আর মনে মনে ভাবছেন কীভাবে কথাবার্তা শুরু করা যাবে। ঠিক তখনই শিবানীকে বলতে শোনা গেল, 'তোমার আর কী কী নেশা আছে?'

মুখের ধোঁয়াটুকু ছেড়ে দিয়ে রামানন্দ খানিকটা হকচকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আর কী কী নেশা মানে?'

'পুরুষমানুষের নানারকম নেশা থাকে। অবশ্য একটু আধটু নেশা না করলে পুরুষদের ঠিক মানায় না, তা তোমার নেশাগুলো আমার জানা দরকার। না, লজ্জা পাবার কিছু নেই, বিব্রত হওয়ারও দরকার নেই। লুকনো-টুকনো আমি মোটেও পছন্দ করি না।'

রামানন্দ, তখন শুকনো আম্‌সী। যদিও তাঁর স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তবে মাকে আজীবন দেখেছেন। কোনো মানুষের সঙ্গেই তাঁকে এভাবে কাটা কাটা কথা বলতে শোনেননি। তাছাড়া কোনো মহিলা যে বিয়ের রাতে এভাবে প্রথম বাক্যালাপ শুরু করতে পারেন এমন ধারণাও তাঁর ছিল না।

আমতা আমতা করে বলেছিলেন, 'ব্যস, এটুকুই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে…'

'না আপত্তি নেই। মদেও আপত্তি নেই যদি না সেটা সীমা ছাড়িয়ে যায়।'

'আমি মদ খাই না।'

'হুঁ, বাপির মুখে শুনেছি। ঠিক আছে, তুমি আজ টায়ার্ড। সকাল থেকে অনেক খাটুনী গেছে। সন্ধ্যে থেকে অনেক লোকজনকেও অ্যাটেণ্ড করতে হয়েছে। তুমি এই খাটটায় শুয়ে পড়। আমি, একটা রাত ঐ ইজি-চেয়ারে কাটিয়ে দিতে পারব।'

সত্যিই সত্যিই যখন শিবানী ইজি-চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল, তখন রামানন্দর বিস্ময় যেন ফেটে পড়তে চাইছিল। কয়েক সেকেণ্ড নীরবে শিবানীর দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার এ কথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না।'

যদিও শিবানীর মুখে অভিব্যক্তির রেখা প্রায় অদৃশ্য, তবুও তার চোখের কোণে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের ঝিলিক খেলে গিয়েছিল। কণ্ঠেও সেই স্বর, সে বলেছিল, 'এই

সামান্য কথাটার মানে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এমন বোকা বলে তোমায় আমি ভাবতে চাইছি না।'

সামান্য চাপা এবং ক্ষুব্ধস্বরে রামানন্দ বলেছিলেন, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।'

শিবানীর ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্ন হাসি। যদিও তা তেমন কিছু ধরা পড়ার মত নয়। হাসিটুকু অদৃশ্য করে সে বলেছিল, 'কোনো ছেলে আমাকে শয্যাসঙ্গিনী করার জন্যে বিয়ে করবে এমন কথা আমি জ্ঞানত ভাবি না। তোমার কাছ থেকেও সে আশা আমি করি না। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তুমি আমার কুমারী নামটা ঘুচিয়েছ।'

'এসব তুমি কী বলছ শিবানী?'

'মাসিক কত টাকা হলে তোমার চলে যাবে?

বেশ আহত স্বরেই রামানন্দ বলেছিলেন, 'অফিস থেকে যা মাইনে পাই আমার তাতেই চলে যায়। কারণ আমার কোনো বদ সঙ্গ নেই, বদ নেশাও নেই।'

'শুনে সুখী হলাম। তবে তোমায় একটা কথা বলে রাখা ভাল। এবং সেটা আজই। আমি বেশী কথা বলতে ভালবাসি না। বলতে গেলে তোমার আমার প্রথম পরিচয় আজই। এর আগে যা হয়েছিল, সেটা সৌজন্য। আইনত তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। এখন থেকে এটাই আমাদের সামাজিক পরিচয়। কেন এবং কী জন্য তোমার মত একজন সুন্দর শিক্ষিত সুদর্শন মানুষ আমাকে বিয়ে করল, তা হয়ত আমি বুঝি।'

'কী বোঝ?'

'সেটাই বলছি। আমার বাবার অনেক টাকা। বাবার অবর্তমানে সেই সবকিছুর মালিক হব আমি। এবং আমার অবর্তমানে তুমি হবে...'

বাধা দিতে চেয়েছিলেন রামানন্দ, 'তুমি কিন্তু...'

হাত তুলে রামানন্দকে থামিয়ে শিবানী বলেছিল, 'আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি। তোমার মনোভাব কী তা পরে বোঝা যাবে, তবে প্রথমেই জানিয়ে রাখি, আমার বাবার উইল তৈরী করাই ছিল। এবং সেটা আজ সকালেই সইসাবুদ সমেত রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, এখন থেকে সবকিছুর মালিক আমি। আর আমার মৃত্যুর পর, সমস্ত ব্যবসা, টাকাকড়ি এবং অন্যান্য যাবতীয় চলে যাবে ট্রাস্টির হাতে। আমি আমার জীবদ্দশায় তা পাল্টাতে পারব না। আর আমার স্বামী হিসেবে তুমি আমার সবকিছুই ভোগ করতে পারবে, তবে তা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছানুসারেই। এবার তোমার কথা বলতে পার।'

কিন্তু রামানন্দ কিছুই বলতে পারেন নি। কেবল এটুকু বুঝেছিলেন, শিবানীর বাইরের চেহারাটাই বেঢপ, কিন্তু তার কাছে তিনি নিতান্তই নাবালক। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এমন কঠিন বরফের চাঁই নিয়ে সারাজীবন কেমন করে কাটাবেন? তিনি আরো বুঝেছিলেন তাঁর সংসারে তাঁর ভূমিকা নিতান্তই সামান্য। নিশ্চুপের মত অনেকক্ষণ বিছানায় বসে ছিলেন। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলেন, আপাত কঠোর মেয়েটি কখন যেন তাঁর অতি সন্নিকটে এসে তাঁর একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলছে, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার তোমার স্বাধীনতায় আমি কোনদিনও হস্তক্ষেপ করব না। মরার আগে আমার মা বলে গিয়েছিলেন, স্বামীকে ভালবাসতে, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমাকে আমি ভালবাসব। তোমাকে আমার অদেয় কিছু থাকবে না। এবার তুমি ঘুমোও। অনেক রাত হল।'

জোর করে রামানন্দকে সেদিন শিবানী বিছানায় শুইয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, যতক্ষণ না রামানন্দ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

শিবানী তার কথা রেখেছিল। কোনোদিনও তাঁর কোনো ইচ্ছায় সে বাধা দেয়নি। যখনই তাঁর যা প্রয়োজন হয়েছে তিনি পেয়ে গেছেন। ইচ্ছেমত টাকা তুলেছেন, ঘুণাক্ষরেও কাউকেই তার জন্যে কোনো কৈফিয়ত দিতে হয়নি। তবে তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন, প্রচ্ছন্নে থেকেও শিবানী তাঁর সব হিসেবই রাখেন।

এরপর ভবেশ গত হয়েছেন। গত হয়েছেন রামানন্দর মা। পাকাপাকি ভাবে শিবানীর বাড়িতেই তিনি চলে এসেছিলেন। ভবেশের সমস্ত ব্যবসার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর শৃঙ্খলিত ব্যবস্থায় ব্যবসাও ফুলে ফেঁপে উঠছিল।

অতি দারিদ্র্যাবস্থা থেকে রামানন্দ জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল রাশি রাশি অর্থের। পেয়েওছিলেন। ব্যবসা বাড়ানোর নেশা তাঁকে করে তুলেছিল কর্তব্যনিষ্ঠ। কঠোর হাতে তিনি ওয়ার্কিং পার্টনারের ভূমিকাটুকু পালন করে যাচ্ছিলেন।

ব্যবসার খাতিরে মাঝে মাঝে তাঁকে অন্যত্র যেতে হত। অথবা কখনো কখনো অনেক রাত করে, পার্টি শেষ করে বাড়ি ফিরতে হত। মদ্যপানও করতে হত। কোনো কোনোদিন হয়ত নেশাটা একটু বেশীই করে ফেলতেন। যখন বাড়ি ঢুকছেন, তখন পা টলছে, মাথার অবস্থা টালমাটাল, কিন্তু আধো চেতনার মধ্যে বুঝতে পারতেন একটি কোমল নারী হস্ত তাঁকে বেশ যত্ন করেই বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছে। এইটুকুই। তারপর কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়তেন।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে মনে পড়ে যেত গত রাতের কথা। লজ্জায় এবং সঙ্কোচে তিনি শিবানীর দিকে তাকাতেই পারতেন না। কিন্তু যার জন্যে এত কুণ্ঠা তার দিক থেকে কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া থাকত না। সে তখন টোস্টের ওপর মাখন লাগাচ্ছে। অথবা এগিয়ে দিচ্ছে এগ পোচের ডিসখানা।

মাঝে মাঝে রামানন্দর বেশ আশ্চর্য লাগত। নিজের স্ত্রীকে তিনি বোঝার চেষ্টা করতেন। শিবানীকে ঠিক কোন পর্যায়ের মহিলা বলা যায়? মুখে তার কোন প্রতিবাদ নেই, নেই কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিন্তু অদ্ভুত এক নীরব শাসন আছে, প্রশ্রয় আছে, আছে মমতাময়ী হাতের স্পর্শ। তার দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু হবার উপায় নেই। তার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে কিছু করারও উপায় নেই। বরাবরই একটা জিনিস তিনি লক্ষ্য করেছেন যতই কেন শিবানীকে লুকিয়ে কিছু করতে গেছেন কখন যেন তা তার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ভাবতেন এ মেয়েটার শরীরের মত কী চোখের দৃষ্টিশক্তিটাও অনেক, অনেক বেশী।

মদ্যপানের ব্যাপারে একদিন তিনি নিজে থেকেই কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বোকা বনে গিয়েছিলেন। বলতে চেয়েছিলেন, কোন উপায় ছিল না, পাঁচজনের সাধাসাধিতে—অত্যন্ত দুঃখিত···ইত্যাদি সব বায়নাক্কা।

শিবানীর মুখে হাসি বড় দুর্লভ। সেই দুর্লভতা নিয়েই শিবানী বলেছিল, 'আমি জানি পুরুষ মানুষের একটু আধটু নেশা থাকে। যে পুরুষ সামান্য নেশা করে না তাকে বড় জোলো মনে হয়। চিন্তার কিছু নেই, তবে মাত্রাটা ধরে রাখার চেষ্টা কর।'

বলে কী এ মেয়ে? স্বামী নেশা করে বাড়ি ফিরলেও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নেই কোন বকাঝকা! নেই কোন অনুযোগ! তবে কী শিবানী তাকে ভালবাসে না। স্বাধীনতা মানে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। কিন্তু সে ধারণাও পাল্টে গিয়েছিল। একদিন রামানন্দ বলেছিলেন, 'শিবানী তুমি তো সারাদিন বাড়িতেই থাক, আর আমায় থাকতে হয় বাইরে বাইরে। প্রায় দিনই এটা সেটা পার্টির ঝামেলা লেগেই থাকে। এক কাজ কর না, তুমিও আমার সঙ্গে পার্টিতে চল। অন্তত তুমি সামনে থাকলে নেশা-টেশাগুলো কম হয়।'

কথা হচ্ছিল সন্ধ্যেবেলা চায়ের টেবিলে বসে। চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে তার ভাবলেশহীন মুখ বেশ কিছুক্ষণ রামানন্দর দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর নিজের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলেছিল, 'পার্টিতে তোমার একটা সম্মানের জায়গা আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাতো থাকবেই। ঘোষ কেমিক্যালসের ডিরেক্টর বলে কথা। কোম্পানীকে

রিপ্রেজেন্ট করছি। লোকে সমীহ তো করবেই।'

স্থির দৃষ্টিতে রামানন্দর দিকে তাকিয়ে শিবানী বলেছিল, 'সেই সম্মানটা নষ্ট করা কী উচিত?'

'তার মানে?'

'আমি তোমার সঙ্গে থাকলে, ঠিক কথা, সামনাসামনি কেউ কিছু বলবে না, বলতে সাহসও পাবে না, কিন্তু ভেবে দেখেছ কী, তোমার আড়ালে আমার এই কদাকার চেহারাটা নিয়ে কতটা হাসাহাসি হবে?'

'তাতে কী এসে গেল?'

'কিছু না। কেবল তোমার মত সুদর্শন মানুষ আমাকে বিয়ে করার পিছনে তোমার যে অন্য মতলব আছে সে কথাটাও বেশ ফলাও করে মুখরোচক আলোচনা করতে কেউ ছাড়বে না।'

'কিন্তু তোমারও কী মনে হয়, তোমাকে বিয়ে করেছি কেবল তোমার টাকার জন্যেই?'

আবার সেই জরদগব মুখটি রামানন্দর দিকে ফিরে তাকায়। তারপর বলে, 'একই কথা বার বার বলতে আমার ভাল লাগে না। পছন্দও করি না। আমার যা বলার বিয়ের রাতেই বলেছিলাম। তবু বলছি, আমাকে বিয়ে করার পিছনে তোমার কী মানসিকতা ছিল তা নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই, কোন মাথাব্যথাও নেই। আমাকে তোমার পাশে কোন পার্টি বা বোর্ড মিটিং বা কোন সামাজিক আসরে কোন দিনই পাবে না। এবার অন্য প্রসঙ্গে কথা বল।'

রামানন্দর কিছু বলার ছিল না। কারণ শিবানী যা বলছে, আক্ষরিক অর্থে তা ঠিকই। প্রসঙ্গ তিনি তোলার জন্যেই তুলেছিলেন। হয়তো বা স্ত্রীর মন রাখতে। কিন্তু সত্যিই কি তাঁর ভাল লাগত, কোন পার্টিতে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে শিবানীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে। সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াত। তখন তিনি নিজেই গোপনীয়তার আশ্রয় নিতেন। লুকিয়ে চুকিয়ে অনুষ্ঠান সারতে যেতেন। তাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হত বোঝাপড়ার গণ্ডগোল। হত সাংসারিক অশান্তি। শিবানী এক অদ্ভুত ধাতুতে গড়া। নিজের শারীরিক বৈকল্যতে হয়তো সে মানসিক পীড়িত। তবু প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না ঐ মহিলার জাগতিক জ্ঞান প্রচুর। কোনটা বিসদৃশ এবং কোনটা হওয়া উচিত নয় এ বোধ তার অতি প্রবল।

রামানন্দও আর জেদাজেদি করতেন না। শিবানীও সব বুঝত। বুঝত রামানন্দর দুঃখটা। রামানন্দর টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি, সামাজিক প্রতিপত্তি

সব পেয়েছে। কিন্তু একটা জায়গায় তার নির্জনতা, তার অপ্রাপ্তি মারাত্মক। জীবনের একটা পরম প্রাপ্তি থেকে সে বঞ্চিত। শিবানী বেশ ভাল করেই জানে, রামানন্দর দাম্পত্য জীবন বিষময়। শিবানীর পক্ষে স্বামীর এই ন্যায্য চাওয়াটুকু মেটানোর ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা থাকলেও রামানন্দর তাকে কোন মতেই ভাল লাগতে পারে না! জোর করে চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারগুলো মেটাতে গেলে অবশিষ্ট যা থাকবে তা হবে রামানন্দর বিরক্তি, রামানন্দর অতৃপ্তি আর ঘৃণাবোধ। হ্যাঁ, তাই কোন পুরুষের পক্ষেই তাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তার দেহের কোথাও রমণীয় সৌন্দর্যের অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা এক বিশাল ভয়ংকরত্ব।

শিবানীর আত্মসম্মান বোধ প্রখর। সে কারো বিতৃষ্ণার পাত্রী হতে রাজী নয়। বরং এই ভাল, একটি নিরাপদ দূরত্বে থেকে ভালবাসার পরশ ছড়িয়ে দেওয়া। শিবানী রামানন্দর অপ্রাপ্তির দুঃখটুকু বোঝে। তাই তার সামান্য ছোটোখাটো উপদ্রব সে সহ্য করে। মনে মনে ভাবে লোকটাকে তো কিছু নিয়ে থাকতে হবে। স্বামীর প্রতি তার সহানুভূতি বড় প্রবল। একদিন, স্বল্পবাক শিবানী স্বামীকে বলেছিল, 'আমি তোমায় জীবনের এক বড় দিক থেকে বঞ্চিত করেছি তা ঠিক, তবে তোমার কেউ ক্ষতি করলে বা তার চেষ্টা করলে আমার দেওয়া শাস্তি তাকে পেতেই হবে। আমি থাকতে কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।'

শিবানীর কথার মানে সেদিন রামানন্দর পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। অবশ্য এই মেয়েটিকে রামানন্দ কোনোদিনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। বোঝার চেষ্টা ছেড়েও দিয়েছিলেন। জীবনের একটা দিককে সম্পূর্ণ অবহেলা করেই রামানন্দ মেতেছিলেন ব্যবসার উত্থানপতনে।

তবু রামানন্দর জীবনে স্খলন এলো। আর সেটাই বুঝি স্বাভাবিক। তখন রামানন্দের বয়েস চল্লিশ ছুঁই ছুঁই।

গঙ্গার ধার ধরে হাঁটছিল শ্যামদুলাল। যদিও এটা তার বাড়ি ফেরার পথ নয়। তার বাড়ি শ্যামবাজার ছাড়িয়ে টালা পার্কের কাছে। সাধারণত অফিস ছুটির পর সে বাড়িই ফিরে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে কী যে তার হয় শ্যামদুলাল নিজেও

তা ভালমতন বুঝতে পারে না। একটা অদ্ভুত রোগে সে মাঝে মাঝেই ভোগে। রোগটার বহিঃপ্রকাশ অন্য কারো চোখে পড়ার কথা নয়। যেমন সহজ স্বাভাবিক থাকার তেমনিই থাকে। কেউ কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তরও পাওয়া যাবে। কোন অসংলগ্ন প্রতিক্রিয়াও থাকে না। কিন্তু শ্যামতুলাল কেবলমাত্র নিজেই বুঝতে পারে সেই অদ্ভুত রোগটা তাকে গ্রাস করেছে। রোগটা যে কবে থেকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে তাও সে জানে না। রোগটার যে কী নাম তাও সে জানতে পারেনি। মাঝে মাঝে শ্যামতুলাল ভেবেছে কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। কিন্তু যাব যাব করেও আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

রোগটার প্রকৃতি বড় অদ্ভুত। কিছুটা সময়ের জন্যে সব কিছু ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাওয়া। কিছুটা সময়ের জন্যে একটা ঘোর। একটা অন্ধকার অবস্থা। পরিপূর্ণ প্রকৃতিস্থ থেকেও তার আগে-পড়ে কোন কিছুই মনে পড়ে না। সমস্ত জগৎ সংসার তখন কেমন যেন অপরিচিত মনে হয়। প্রতিদিনের দেখা জিনিসকেও যেমন যেন নতুন লাগে। অদ্ভুত একটা স্বপ্নের ঘোর তাকে পেয়ে বসে। সারা শরীরে এক অজানা প্রতিক্রিয়া। রক্তে এক বিস্ময়কর চাঞ্চল্য। মাথার মধ্যে অজস্র ভার। ঘোর লাগা চোখ তুটো জ্বালা করতে থাকে···অনুভূতিতে প্রচণ্ড ছটফটানি··· ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হয় সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে। রাগের অনুভূতিটা যখন চরমে ওঠে তারপরই হয়ে যায় সব কিছু অন্ধকার। নিকষ অন্ধকার। তারপর তার চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে যায়। আবার আলোর জগতে ফিরে এলে, সব কিছু সহজ হয়ে এলে সে মনে করার চেষ্টা করতে থাকে, অন্ধকার আর আলোর মধ্যবর্তী সময়টুকুতে সে কোথায় ছিল, কী করেছে, কোথায় গিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই মধ্যবর্তী অন্ধকারের সময়টুকু তার চেতনায় ফিরে আসে না।

গঙ্গার ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে শ্যামতুলাল ভাবছিল, আজ কি আবার সেই পুরনো ব্যাধিটা তাকে চেপে ধরবে। সকাল থেকেই সে অনুভব করছিল ভেতরের সেই ছটফটানিটা, রক্তে বিষম চাঞ্চল্য তাকে অস্থির করে তুলছিল ভেতরে ভেতরে।

শ্যামতুলাল ঘোষ কেমিক্যালসের পি. এ টু ডিরেক্টর। অনেকদিনের পাকা, পুরনো চাকরি। জীবনটাও তার এই চাকরির মত নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। সংসারে স্ত্রী আর তুই ছেলে। ছেলেরা পড়াশুনা করে, স্ত্রীও এক সওদাগরি অফিসের জুনিয়ার অফিসার। সংসার জীবনে তার কোন ক্ষোভ নেই। নেই কোন হতাশা। থাকার কথাও নয়। কিন্তু···

হ্যাঁ সেই কিন্তুটাই তাকে মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ করে তোলে। সেই কিন্তুটাই

তাকে নিয়ে যায় অন্যতর এক মানসিক বিক্ষোভের মুখে। দাঁড় করায় এক কল্পিত শত্রুর মুখোমুখি। শুরু হয় অন্তর্বর্তী সংগ্রাম। মানসিক চিন্তাও যত বাড়ে, ততই মাথার সেই যন্ত্রণা প্রবল হয়। তারপর একসময়ে আসে চিন্তা বিলুপ্তি। আসে সেই অন্ধকার অবস্থাটা। লোপ পায় সমস্ত জগৎ সংসার।

গত কয়েকদিন সেই 'কিন্তু' আবার তাকে চাবুক মারতে শুরু করেছে। সারা-দিন কেটেছে অস্থিরতার মধ্যে। তারপর ছুটির শেষে, সে আর বাড়ির পথ ধরেনি, কখন যেন হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে এই গঙ্গার ধারে। আকাশে তখন সূর্য ডোবার রং। একসময় দাঁড়িয়ে পড়ে। তার চোখের রক্তিমাভা। স্মৃতির কুহেলি কাটিয়ে অতীত যেন সামনে এসে দাঁড়ায়। মাথা চাড়া দেয় সেই 'কিন্তু'র উৎসমুখ।

তখন চব্বিশ বছরের যুবক শ্যামদুলাল দত্ত। তরজাজা যুবক। চোখে ভবিষ্যতের অজস্র স্বপ্ন। ঘোষ কেমিক্যালসে চাকরি পেয়েছিল নিজের যোগ্যতায়। একশ'জন প্রতিযোগীর মধ্যে সে হয়েছিল প্রথম। যদিও চাকরিটা বিরাট মাপের কিছু না। স্টেনোগ্রাফার, সামান্য স্টেনোগ্রাফার। কিন্তু নিজের তৎপরতা, ভালো ইংরেজী জানা, কথায়বার্তায় চৌকস শ্যামদুলাল ঘোষ কেমিক্যালসের তদানীন্তন ম্যানেজিং ডিরেকটার ভবেশ ঘোষের নেকনজরে চলে আসে। ভবেশ-বাবুর বলার আগেই সে তার কাজটুকু সম্পন্ন করে ফেলত। কোথায় কবে কোন টেণ্ডারের জন্যে নোট পাঠাতে হবে, কোথায় কবে কোন পার্টির অর্ডার ক্যানসেলশনের জন্যে ডেমারেজ স্যুট করতে হবে, ইত্যাদি নানান ব্যবসা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তার হিসেবের মধ্যে থাকত। ঠিক সময়ে ঠিক বিষয়টি সে মালিকের নজরে এনে তাঁর খাটনি লাঘব করত। এ ছাড়াও আরো কিছু যোগ্যতা তাকে নিয়ে এল ভবেশের অত্যন্ত কাছাকাছি একজন বিশ্বাসযোগ্য বিচক্ষণ কর্মী হিসেবে। অচিরেই সে তার ফল পেয়েছিল। সামান্য স্টেনোগ্রাফার থেকে সে হয়েছিল পি. এ টু এম. ডি। অল্পদিনের মধ্যেই তার মাইনে বেড়ে গিয়েছিল প্রায় তিনগুণ।

শ্যামদুলাল এত বেশী বিশ্বস্ত হয়েগিয়েছিল ভবেশবাবুর কাছে যে অবসর সময় ভবেশবাবু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সুখ দুঃখের কথা বলে ফেলতেন। আর শ্যামদুলাল তার সামর্থ্য অনুসারে ভবেশের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোকেও সমাধান করে দেবার চেষ্টা করত।

ভবেশের ব্যক্তিজীবনের বিরাট হাহাকারের দিক ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা শিবানী। শ্যামদুলাল তা জানত। শিবানীকে দেখেওছিল বহুবার। কিন্তু তার

তুখোড় মস্তিষ্ক শিবানী সমস্যার কোন উপযুক্ত সুরাহা খুঁজে পায়নি। চব্বিশ বছরের শ্যামদুলাল স্বপ্ন দেখত সুখীভবিষ্যতের, স্বপ্ন দেখত শাঁসালো চাকরী, সুন্দরী স্ত্রী আর একটি নিজস্ব ছোটখাটো বাড়ির। ভবেশের এই দুঃখটাকে সে তার নিজের দুঃখ বলেই ভাবতো। ভাবতো ঘোষ কেমিক্যালসের পরবর্তী মালকিনের জীবন খুব ভয়াবহ রকমের দুঃসহ। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সহানুভূতি জানানো ছাড়া তার আর করারও কিছু ছিল না।

অথচ সেই সমস্যার একদিন সমাধান হয়ে গেল। যে সম্ভাবনার কথা তার মগজে একদিনের জন্যেও উঁকি দেয়নি, কোথাকার এক উট্‌কো লোক এসে তার ভবিষ্যতের সব কিছু ভাবনা ওলটপালট করে দিল।

শ্যামদুলাল ভেবেছিল মালিককে খুশি করতে পারলে সে ঘোষ কেমিক্যাল্‌সের অনেক উঁচু জায়গায় উঠে যেতে পারবে। হয়ত পারতও। কিন্তু পারল না। কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল রামানন্দ বসু। সুন্দর, সুঠাম, তরতাজা অথচ লাজুক রামানন্দ।

শ্যামদুলালের ভাগ্যের চাকাটা যেন হঠাৎই থেমে গেল। তার স্বপ্নের জগৎ-টাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে রামানন্দ এগিয়ে চলল তীরগতিতে।

দেখতে দেখতে স্বভাবলাজুক রামানন্দ হয়ে গেল ভবেশের ডানহাত। যে পরামর্শ এতদিন ভবেশ করতেন শ্যামদুলালের সঙ্গে, কখন যেন রামানন্দ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে ভবেশের। এমনকি, শ্যামদুলালের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি, তাই সম্ভব হল রামানন্দর ক্ষেত্রে। ছুটির পর এম. ডি.-র গাড়িতে তারই পাশে বসে রামানন্দ তাঁর সহযাত্রী হয়েছে। প্রায় নিত্যদিনই।

ভোজবাজির মত সব কিছু পাল্টে যেতে লাগল। একদিন শ্যামদুলাল দেখল, কোম্পানীর নতুন ম্যানেজার হয়েছে রামানন্দ বসু। এর অর্থ শ্যামদুলাল রামানন্দকে সম্বোধন করবে 'স্যার' বলে।

এর কিছুদিন পর আরো একটি সংবাদ স্তম্ভিত করছিল শ্যামদুলালকে। ভবেশকে খুশী করতে সে সব কিছু করেছে, কিন্তু যেটা সে করতে পারেনি, সেটাই সম্ভব করেছে রামানন্দ।

মাঝে মাঝে এখনও শ্যামদুলালের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। এ সম্ভাবনার কথা কেন একবারও তার মনে আসেনি। সেও তো পাল্টি ঘরের ছেলে। সেও তো পারত রামানন্দ যেটি করতে পেরেছে সেটি করতে। রামানন্দর সঙ্গে শিবানীর বিয়ে। এর অর্থ ঘোষ কেমিক্যালসের পরবর্তী মালিক রামানন্দ বসু। ভবেশ ঘোষের ঐ চেয়ারটায় একদিন বসবে রামানন্দ বসু। আর সে শ্যামদুলাল দত্ত,

পরিচয় তার, পি. এ. টু এম ডি।

ঈর্ষার ঘুন পোকাটার জন্ম বোধ হয় তখনি। যে ব্যাধিতে সে এখন ভুগছে, এর জন্ম বোধহয় তখন থেকেই।

নাগালের মধ্যে থেকে সোনার আপেল ছিটকে গেছে। এখন কেবল অথর্ব বেদনা নিয়ে যন্ত্রণা পাওয়া। আজ চল্লিশোর্ধ্ব জীবনে মাঝে মাঝেই তার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে তীব্র প্রতিহিংশায়। মনে মনে কল্পনা করে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। রামানন্দকে জব্দ করতে হবে, রামানন্দকে করতে হবে সিংহাসনচ্যুত। কিন্তু সে জানে না কেমন করে? কল্পনায় সে বহুবার রামানন্দকে হত্যা করেছে……কিন্তু বাস্তব যা—তাহল সে রামানন্দর এক অধস্তন কর্মচারী মাত্র।

রামানন্দ নিধনের চিন্তা যখন তাকে অস্থির করে তোলে ঠিক তখনই রোগটা মাথা চাড়া দেয় …ভাবতে ভাবতে কখন একসময় সে হারিয়ে যায় অন্ধকারে ঘুর্নিতে। আর তখন তার কোন জ্ঞানই থাকে না…

গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বছর দেড়েক আগের এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যের কথা মনে পড়ে গেল শ্যামদুলালের। সেই সন্ধ্যের কথা, সব না হলেও কিছুটা মনে আছে। প্রায় ছ সাত মাস যাবৎ সারা অফিসে একটি গুঞ্জন চলছিল। স্বয়ং রামানন্দর বিরুদ্ধেই। দেবচরিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠ রামানন্দর জীবনে একটা স্খলন ঘটেছে। সে নাকি কোন এক বারবনিতার গৃহে প্রতিদিনই যাতায়াত করে।

এ হেন মুখরোচক সংবাদ করণিককুলের রসালাপ হতে পারে। কিন্তু শ্যামদুলাল অত স্বাভাবিক ভাবে সংবাদটি উড়িয়ে দিতে চায় নি। রামানন্দর পতন যে তার একান্ত কাম্য। গোপনে সে রামানন্দকে অনুসরণ করা শুরু করল। ঘটনা যদি সত্য হয় তবে রামানন্দর মৃত্যুবান তারই হাতে। শ্যামদুলাল জানত শিবানীর কানে কোনক্রমে যদি রামানন্দর অধঃপতনের সংবাদটি পরিবেশন করা যায় তাহলে কোনমতেই রামানন্দর জীবন এত শান্তিতে কাটবে না। কোন মেয়ের পক্ষেই স্বামীর পরনারীগমন মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। শিবানীরতো নয়ই। শিবানীকে তো অনেকদিন ধরেই সে দেখছে…।

বছর দেড়েক আগের একটা দিন বেশ গভীর ভাবে নাড়া দেয় শ্যামদুলালকে। মাঝে মাঝেই। খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট। দিনটা ছিল বৃষ্টির দিন। সারাদিনই ঝিমঝিম বৃষ্টি লেগেই ছিল। বিকেলের দিকে নামল জোরে। রামানন্দর মত শ্যামদুলালও অফিস কামাই করতে ভালবাসত না। রোজকার মতই সে অফিসে গিয়েছিল। কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া তার ধাত নয়। এ জন্য সে

রামানন্দরও বেশ প্রিয়পাত্র। রামানন্দ তাঁর ব্যক্তিজীবন ছাড়া বাকী সব কিছু নিয়েই শ্যামদুলালের সঙ্গে আলোচনা করতেন। এখনও করেন।

সেদিনও সারাটা সময় দুজনে কাজ করেছেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রামানন্দ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টির কথা তুলে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিলেন। সাধারণত শ্যামদুলাল অফিস থেকে বেরুতো সাড়ে ছটা সাতটার আগে নয়। রামানন্দ থাকাকালীন তাকে থাকতেই হ'ত।

আপত্তি জানায়নি শ্যামদুলাল। সত্যিই আবহাওয়ার অবস্থা ছিল বেশ খারাপ। তার ওপর তাকে ফিরতে হবে উত্তর কোলকাতার টালা নামক একটুতেই বৃষ্টিজমা এলাকায়। তবু হাতের কাজকর্ম গুছিয়ে রেখে নিচে নামতে নামতে প্রায় ছটা বেজে গিয়েছিল। বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েও ছিল। আধঘণ্টা কি পৌনে একঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন বাসের আসা সে ছেড়ে দিয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই এক অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যে একটি ট্যাক্সি এসে তার সামনেই দাঁড়ায়। এবং ভাড়া মিটিয়ে আরোহী নেমেও পড়ে। এ সুযোগ নষ্ট করা যায় না। শ্যামদুলাল তড়িৎ তৎপরতায় ট্যাক্সিটি পাকড়াও করে যে মুহূর্তে তার গন্তব্যস্থলের উল্লেখ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখতে পায়, ঐ প্রবল বর্ষণের মধ্যেও রামানন্দ অফিসবাড়ি থেকে নেমে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এবং গাড়ির মুখ ফেরালেন দক্ষিণের দিকে।

চকিতে একটি সন্দেহ, যে সন্দেহ নিয়ে সারা অফিসে কানাঘুষো, শ্যামদুলালের মাথায় সেটি ধাক্কা দিল। রামানন্দর বাড়ি তো ওদিকে নয়। তিনি তো যাবেন লেকটাউন। এই বৃষ্টি মাথায়, ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে কোথায় যেতে চান।

দেড় বছর পর, আজও স্পষ্ট মনে আছে, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বেশী পয়সার লোভ দেখিয়ে সে রামানন্দর গাড়িটিকে অনুসরণ করতে বলে। রামানন্দর গাড়ি তখন ছুটে চলেছে এসপ্ল্যানেডের দিকে। এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে চৌরঙ্গী। চৌরঙ্গী ধরে গাড়ি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ডানফুটে AAEI-এর পার্কিং জোনে। বৃষ্টির জলে ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে শ্যামদুলাল দেখে নিজের গাড়ি থেকে নেমে রামানন্দ অপেক্ষা করছেন উল্টো ফুটের গাড়ি বারান্দার নিচে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল তার সামনে। আশ্চর্য, রামানন্দবাবু গিয়ে উঠছেন একটা সাধারণ ট্যাক্সিতে। আর ট্যাক্সিটা যেন তাঁরই জন্যে এসে দাঁড়ালো। তিনি গিয়ে গাড়িতে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। গিয়ে পৌঁছল পার্ক স্ট্রীটে।

বাঁদিক ঘুরে সোজা এগিয়ে গেল ক্যামাক স্ট্রীটের মুখ পর্যন্ত। তারপর ডানদিক। আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে এক অতি নির্জন রাস্তায় গিয়ে গাড়ি থামল। ট্যাক্সি থেকে নেমেই রামানন্দ উল্টো ফুটে ছুটে চলে গেলেন। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

একটা অদ্ভুত কৌতূহল পেয়ে বসেছিল শ্যামদুলালকে।

কোথায় যেতে চান রামানন্দ? এই দুর্যোগের সন্ধ্যায়, প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে, নিজের গাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সি চেপে এ রকম এক নির্জন স্থানে, এই ফ্ল্যাট বাড়িতে তাঁর আবার কী প্রয়োজন? কে থাকে এখানে? নিজের বাড়ির থেকেও নিশ্চয় আরো বড়ো কোন আকর্ষণ আছে এখানে। নইলে রামানন্দর মত নিয়মমানা সুখী মানুষ তো এই দুর্যোগে এখনে আসতে পারেন না। স্থান কাল পাত্র সবকিছু ভুলে গিয়েছিল শ্যামদুলাল। রামানন্দর রহস্যময় গতিবিধি, বহুদিনের জমানো ক্ষোভ, রামানন্দর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত শ্যামদুলাল সেই মুহূর্তে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সেই বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যাতেও তার গা গরম হয়ে উঠেছিল। মাথার মধ্যে শুরু হয়েছিল রোমাঞ্চকর দপদপানি। চোখের কোণে ভেসেছিল প্রতিহিংসার উষ্ণস্রোত। কালবিলম্ব না করে ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতে একটা কুড়ি টাকার নোট গুঁজে সে নেমে পড়েছিল। রামানন্দর মতই ছুটে রাস্তা পার হয়ে সে ঢুকে গিয়েছিল সে বিশাল বাড়িটায়।

বাড়িটা বিশাল হলেও, লোকজন প্রায় কেউই ছিল না। হয়ত তা বৃষ্টির কারণেই। অথবা সাধারণত ফ্ল্যাট সিস্টেমের বাড়িতে যেমন লোকজনের নিত্য যাতায়াত কম হয় সেই রকম একটা খালি খালি ভাব।

শ্যামদুলাল সদর পার হয়েই দেখতে পেল রামানন্দ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছেন। যদিও লিফট্ ছিল। তবুও লিফট্ না নিয়েই তিনি ধীরে ধীরে ওপরে যাচ্ছেন। শ্যামদুলালও নিরাপদ ব্যবধান রেখে সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠেছিল। দোতলা অতিক্রম করে রামানন্দ গিয়ে দাঁড়ালেন একটি নির্দিষ্ট ঘরের সামনে। দরজায় কয়েক সেকেণ্ড মত বেল টিপে অপেক্ষা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে গেল। রামানন্দ ধীর পায়ে ঢুকে গেলেন। তারপর ·····?

হ্যাঁ তারপর—সব অন্ধকার। চকিতে সবকিছু ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল। শ্যামদুলালের সামনে নেমে এল একরাশ অন্ধকার।

মনে নেই। কিছুই মনে নেই। গত দেড় বছরেও শ্যামদুলাল কিছুতেই মনে করতে পারে না সেই প্রবল উত্তেজনাময় পরিস্থিতির কী পরিণতি হয়েছিল। মনে

নেই তারপরের কোন ঘটনাই। সেই অন্ধকার থেকে আলোর জগতে সে যখন ফিরে এসেছিল, তখন তার কানে এসেছিল কয়েকটি কথা। নিজেকে সে আবিষ্কার করেছিল নিজের বাড়িতে। তার ভিজে জামা কাপড়ে কাদা, সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরছে জল, আর জ্ঞান ফিরেছিল স্ত্রী মণিকার কথায়। কোথায় গিয়েছিলে এত রাত পর্যন্ত, কী হয়েছে তোমার, এত থমথমে মুখ, মনে হচ্ছে যেন খুব ভয় পেয়েছো ·····এমনি আরো সব কিছু কথা।

উত্তর দিতে পারেনি শ্যামদুলাল। কেননা, আজও সে নিজেও জানে না, দেড় বছর আগের সেই সন্ধ্যায় পরবর্তী ঘটনা কী ঘটেছিল।

শ্যামদুলাল আবার অফিসে এসেছে। নিয়মিত নিজের কাজ করছে। শর্মিলা খুনের কথা কাগজে পড়েছে। মনের মধ্যে সন্দেহ তোলপাড় করছে। রাগ আর ঘৃণা মিশ্রিত চোখে রামানন্দকে দেখেছে। কিন্তু প্রমাণসমেত রামানন্দকে সে ফাঁসাতে পারেনি। তারপরেও অনেকবার সে চেষ্টা করেছে রামানন্দ যদি আর একবার ঐ বাড়িতে যায়। কিন্তু রামানন্দ যেন ভুলে গেছেন সে বাড়ির কথা। এই দেড় বছরে কোনদিনও শ্যামদুলাল রামানন্দকে বেচাল হ'তে দেখেনি। দেখেনি ও বাড়ি যেতে।

দেড় বছর আগের সেই সন্ধ্যে আজও শ্যামদুলালের কাছে রহস্যের যবনিকায় মোড়া। এখনও মাঝে মাঝে, মাথায় যখন অসহ্য যন্ত্রণা হয়, শরীর যখন অস্থির হতে থাকে শ্যামদুলাল চলে আসে গঙ্গার এই নির্জন স্থানে। অতীতে হারিয়ে যাওয়া সেই রহস্যসন্ধ্যার জট ছাড়াতে।

'চলুন না, ঐ গাছতলায় গিয়ে বসি। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

চমকে ওঠে শ্যামদুলাল। মহিলা কণ্ঠ। সাদরে আহ্বান জানাচ্ছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখেন বছর কুড়ি বাইশের শ্যামলা রঙের একটি মেয়ে। উগ্রতার প্রসাধন। আরো উগ্রতর গায়ের সস্তা এসেন্স। শ্যামদুলালের বুঝতে অসুবিধা হয় না। ত্বরিত পা বাড়ায় বাড়ির দিকে। 'ইস্' এত রাত হয়ে গেছে। ঘড়িতে তখন রাত প্রায় নটা।

ঘোষ কেমিক্যালসের ঝকঝকে তিনতলা অফিস বাড়িটার সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সোহনলাল। অনেক কষ্ট করে দেড় বছর পর এই লোকটার পাত্তা করতে পেরেছে। নেহাতই বরাতের জোরে। নইলে সেদিন জলুস বেরিয়ে

রাস্তাঘাট অত জ্যামই বা হবে কেন আর চুরচুরে নেশার মেজাজ নিয়ে সেই বা কেন লোকটার গাড়ির সামনে গিয়ে পড়বে। এও নসীব। আরো একটা বড় নসীব ঘটে গিয়েছিল সেদিন। অত জ্যাম দেখে সাহেবের গাড়ির পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল প্যাসেঞ্জার। সঙ্গে সঙ্গে সেও গিয়ে ট্যাক্সিটা নিয়ে নিতে পেরেছিল। যোগাযোগ যখন হয় এমনি করেই হয়। তারপর সাহেবকে অনুসরণ করে তার বাড়ি আর অফিস চিনে নিয়েছে। বেশ কয়েকদিন ছিনে জোঁকের মত সাহেবের পিছু পিছু ঘুরেছে। আর মনে মনে ভেবেছে তার প্ল্যান। এবার আর বাছাধনকে পার পেতে হচ্ছে না। গত দেড় বছর ধরে তার হাঁড়ির হাল করে ছেড়েছে ঐ বাবুটি। শর্মিলাও মরল, তারও স্ফূর্তির প্রাণটি খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হল। এই দেড় বছরে সে নিজের দিকে তাকাতেও পারেনি। কোনদিন খাওয়া জুটেছে, কোনোদিন জোটেনি। সব থেকে কষ্টকর নেশার জোগান দেওয়া। জুয়োটুয়ো খেলে যেদিন পকেটে কিছু রেস্ত আসে তখনই সে নেশা করতে পারে। নইলে হরিমটর। নিজের জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে নিজেই লজ্জা পেল। ভিখিরির হাল। প্যাণ্টটা যে কতকাল কাচা হয়নি কে জানে। জামাটার অনেক জায়গায় সেলাই কেটে গেছে। ফেটেও গেছে কলারটা। জায়গায় জায়গায় বাসি তরকারি আর মদের ছিটে। আর জুতো! সেটা যে কীভাবে এখনও পায়ে লেগে রয়েছে কে জানে।

মুখে বেশ কয়েকদিনের না কামানো কাঁচাপাকা দাঁড়ির আগাছা। রুক্ষ চুল আর লাল লাল চোখ। অথচ শর্মিলা বেঁচে থাকতে কী তার কেতা! একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে সোহন খানিকটা শঙ্কিত হয়। যা সুন্দর সাজানো ঝকঝকে বাড়ি, গেটে পরিষ্কার জামা-কাপড়-পরা দারোয়ান। তার এই ছিন্নবাস, জীর্ণ ভবঘুরে চেহারা দেখে ভিখিরি বলে না গেটেই আটকে দেয়।

এতদূর এসে আর পিছনোর কোনো মানেই হয় না। আর পিছনো মানে আখেরের ইতি। যে লোকটা তার সুখের কাঁটা, তাকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। কপাল ঠুকে সে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। অনেক লোকই ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। প্রত্যেকেই ব্যস্তসমস্ত। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ নিয়ে যাতায়াত করছে। অবশ্য সেও এসেছে, কাজ নিয়েই। হ্যাঁ এও তো বিরাট কাজ। বাঁচার তাগিদ। সেকেণ্ডখানেক ইতস্তত করেই সে হড়বড় করে ভেতরে চলে এল। আশ্চর্য গেটের লোকটা তাকে যেন দেখেও দেখল না। ঢুকতে কোনো বাধা দিল না। কৈফিয়তও চাইল না।

সোহনলাল পরে জেনেছিল, বাড়িটা একা ঘোষ কেমিক্যালসের নয়। এক-

তলায় আরো অনেক অফিস-টাফিস আছে। দোতলা আর তিনতলাটাই ঘোষ কেমিক্যালসের আণ্ডারে।

যাইহোক, একে তাকে জিজ্ঞাসা করে সে এসে থামল তিনতলার একটা কাচ-দরজার সামনে। নিওনের আলোয় আর জৌলুসদার চেয়ার টেবিলের কেতায় ভেতরটা ঝকমক করছে।

টেলিফোনের বক্সের সামনে এক তরুণী কানে ইয়ার ফোন লাগিয়ে সমানে কথা বলে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে সোহনলাল তরুণীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তরুণী তখন যেন কারো সঙ্গে বিশেষ কিছু কথা বলতে ব্যস্ত। তার এদিকে কোনো নজরই ছিল না। খুব সম্ভবত সোহনের দেহনির্গত দুর্গন্ধে তরুণী মুখ তুলে দেখল। বেশ বোঝা গেল তার মুখে বিরক্তি।

'জাস্ট এ মিনিট!' বলে তরুণীটি মুখ থেকে স্পীকারটি সরিয়ে সোজাসুজি সোহনের দিকে তাকাল। সম্ভবত একবার তার সর্বাঙ্গ জরিপ করে নিয়ে বলল, 'কাকে চান?'

গলার আওয়াজটি যথাসম্ভব গম্ভীর রেখে সোহন বেশ ভারিক্কি চালে বলল, 'মিঃ বাসু।'

এবার তরুণীটির মুখে অবিশ্বাস। সে ভাবতেই পারে না এমন একটি লোকের সঙ্গে মিঃ বাসুর কী ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে? একে তো তিনি কোম্পানির ডাইরেক্টর, তার ওপর অত্যন্ত শৌখিন মানুষ, তিনি কীভাবে···

সোহন হয়তো বুঝেছিল তরুণীর মনোভাব। সে তাকে কোনো আমল না দিয়েই, বলল, 'হ্যাঁ, উনার সঙ্গে আমার এ্যাপয়েন্টমেণ্ট আগে থেকেই করা আছে। মেহেরবানী করে খবরটা ভেজিয়ে দিন।'

লোকটিকে তরুণীটি সহ্য করতে পারছিল না, তাই ইণ্টার-এক্সচেঞ্জে যোগাযোগ করল রামানন্দর পি. এ. শ্যামদুলালের সঙ্গে। ফোনে জানাল সোহনলালের কথা। ওদিক থেকে কী কথা হল বোঝা গেল না। মাউথপীসটা সরিয়ে তরুণীটি সোহনকে সামনের দিকে একটা ঘর দেখিয়ে সেখানে যাবার নির্দেশ দিয়ে পুনরায় নিজের কাজে ব্যস্ত হল। সোহনও আর কথা না বাড়িয়ে তরুণী নির্দেশিত ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সাজানো গোছানো ছিমছাম ঘর। সোহন দেখল চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের একজন ঝকঝকে স্মার্ট ভদ্রলোক টেবিলে বসে কাজ করছে। সোহন ঘরে ঢুকতেই শ্যামদুলাল মুখ তুলে তাকাল। তারও চোখ মুখে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। সেও ভাবতে পারেনি এমন একজন পরিবেশ-বিপরীত লোক এখানে আসতে পারে।

তার ওপর সে আবার রামানন্দ বসুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'আমি একটু মিঃ বাসুর সঙ্গে মোলাকাত করতে চাই।'

'বিশেষ কিছু দরকার ?'

'জি হ্যাঁ।'

'আমি ওনার পি. এ। আমাকে বলা যায় না ?'

সোহনলাল নিরুত্তরে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে।

'কিন্তু উনি তো এখন অত্যন্ত সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত।'

'হামার দরকারটা আরো সিরিয়াস বেপার। হামার সঙ্গে মোলাকাত হলে আপনার সাহেবের ফায়দা হোবে। আপনি একটু দেখা করার বেবস্থা করিয়ে দিন।'

সোহনকে আর একবার জরীপ করে নিয়ে শ্যামতুলাল ফোন তুলে বলল, 'অপনার নাম কী বলব ?'

'নামের দোরকার নেই। আপনি এই কাগজটা পাঠিয়ে দিন। তাহলেই হোবে।'

সোহন তার ছেঁড়া শার্টের বুক পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে শ্যামতুলালের দিকে এগিয়ে দিল। ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজ। নির্বিকারভাবে ফোন রেখে শ্যামতুলাল উঠে দাঁড়ল। সোহনকে বসতে বলে সে এগিয়ে গেল ডাইরেক্টরের ঘরের দিকে।

সরকারী একটা অর্ডারের ব্যাপারে রামানন্দ তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রেরিতব্য টেণ্ডারের পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলেন আরো কিছু রেট কমানো যায় কিনা। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল শ্যামতুলাল।

'আমি একটু ব্যস্ত আছি। পরে এসো।'

'কিন্তু স্যার ?'

'কী ব্যাপার ?'

আর কিছু না বলে শ্যামতুলাল সোহনের দেওয়া চিরকুটটা এগিয়ে ধরল।

'কী এটা ?' বলে তিনি চিরকুটের ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

শ্যামতুলাল স্পষ্ট দেখল, রামানন্দর মুখভাব কেমন যেন ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। যে বিরক্তি নিয়ে তিনি চিরকুটটা খুলেছিলেন, এখন সে ভাবটা অন্তর্হিত। বদলে কেমন এক ধরনের ত্রাসের ভাব ফুটে উঠছে। অবিশ্বাস্য হলেও শ্যামতুলালের মনে হল তার ধারণাটা ঠিক ভুল নয়।

'স্যার ?'

কিছু না বলে রামানন্দ ফ্যাকাশে মুখে শ্যামদুলালের দিকে তাকালেন।

'লোকটাকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারতাম। জানি তো আপনি এখন খুবই ব্যস্ত। তবে, ও বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হলে নাকি আপনারই উপকার হবে। ওকে কী চলে যেতে বলব?'

রামানন্দ যেন অনেক কিছু ভাবছিলেন সেইমুহূর্তে। শ্যামদুলালের কথায় তাঁর চমক ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'না ওকে ভেতরে আসতে বল।'

'আচ্ছা স্যার।' বলেই শ্যামদুলাল চলে যাচ্ছিল। রামানন্দ পিছু ডাকলেন, 'লোকটা যতক্ষণ থাকবে ঘরে যেন কেউ না আসে। তোমারও আসার দরকার নেই।'

শ্যামদুলাল বেরিয়ে গেল। রামানন্দ আবার চিরকুটটা খুললেন, জ্বলজ্বল করছে লেখাটা। মাত্র একটি নাম, ইংরাজীত লেখা। শর্মিলা প্যাটেল। সারা কাগজে আর কোথাও কিছু লেখা নেই।

মুহূর্তের মধ্যে দেড় বছর আগের সেই অভিশপ্ত রাতের কথা মনে পড়ে গেল রামানন্দর। সে যেন এক দুঃস্বপ্নের রাত। গত দেড় বছর ধরে প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করেছেন সেই রাতটাকে। একটা ভয় তাঁকে অনেকদিন ধরে তাড়া করে চলেছিল। শর্মিলা হত্যার পর যতদিন এ নিয়ে কাগজ তোলপাড় হয়েছে ততদিনই তাঁর বুকের উথালপাতাল ভাবটা কমেনি। প্রতি মুহূর্তেই সেসময় তাঁর মনে হত, আচ্ছা, কেউ তাঁকে দেখে ফেলেনি তো? যদিও সে রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল, যদিও তিনি আশপাশ দেখেই ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন, কিন্তু ভয়টা তাঁকে ছেড়ে যায়নি। কলকাতার পুলিসকে বিশ্বাস নেই। সামান্য সূত্র ধরেই পুলিস তাঁর কাছে এসে হাজির হতে পারত। নিবিষ্টচিত্তে তিনি অনেকবার ভেবেছেন কোথাও কোনো সূত্র ফেলে এসেছেন কিনা! আশপাশের লোককে, বিশেষ করে কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিশ্চয়ই বলবে শর্মিলার ঘরে নিত্য এক বাবু যাতায়াত করতেন। অবশ্য এটা রামানন্দর ঠিক মনে আছে শর্মিলার ঘরে তাঁর কোনো পরিচয় পত্র নেই। জীবনে তিনি কোনোদিনও শর্মিলাকে কোনো চেকে অর্থ দেন নি। যা দিয়েছেন সবই নগদে। শর্মিলার কাছে তাঁর কোনো ছবিও নেই। এমনকি শর্মিলাকে তাঁর আসল পরিচয়ও তিনি দেননি। সেখানে তিনি রামানন্দ নন। শর্মিলা জানত তার নতুন বাবুটির নাম দীপঙ্কর নন্দী। ব্যবসা-ট্যাবসা করেন। এবং সে ব্যবসা কোথায় এবং কিসের তাও শর্মিলার অজানা ছিল। সাধারণত শর্মিলার মত মেয়েরা, যারা তাদের জীবিকার সন্ধান সাধারণ পথে খুঁজে না পেয়ে দেহের বেসাতি খুলে বসে, তারা ব্যক্তিগত রোজনামচা রাখার

সময় পায় না। সে বিলাসিতাও বোধহয় তাদের থাকে না। সেই হিসেবে খুব সম্ভবত শর্মিলার কোনো ডায়েরি ছিল না। থাকলেও সেখানে থাকবে দীপঙ্কর নন্দীর নাম।

তারপর দিন যত কেটে গেছে, খবরের কাগজগুলো একসময় শর্মিলা নামের এক বারবনিতার রহস্যজনক মৃত্যুর ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে রামানন্দ নিজেকে ফিরে পেয়েছিলেন। মনে মনে সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনে আর এ ভুল নয়। এসব ব্যাপার জানাজানি হয়ে গেলে শিবানীর কাছে মুখ দেখানোই যেত না।

রামানন্দর মনে আর একটা সম্ভাবনার কথা মাঝে মাঝে উঁকি দিত। যে ট্যাক্সিওলা তাকে নিয়মিত পার্ক স্ট্রীটে নিয়ে যেত সে লোকটা না আবার পুলিসে কিছু রিপোর্ট করে। কারণ তাঁর পাপকর্মের অনেক কিছুর সাক্ষী ছিল সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার। ইচ্ছে করলে সেই ড্রাইভারটি তাঁর চেহারার বর্ণনা পুলিসের কাছে তুলে ধরতে পারত। অবশ্য সেখানেও তিনি নিজেকে লুক্কাইত রেখেছিলেন। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ট্যাক্সি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করত। ক্যামাক স্ট্রীটের নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে ড্রাইভার তাঁকে পৌঁছে দিত। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে আবার তাঁকে তুলে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। এর জন্যে সে পর্যাপ্ত অর্থও পেত।

টেবিলের সামনে পাতা চিরকূটটার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথা। আজ দেড় বছর পর সেই লোকটা আবার উৎপাত করতে এল না তো? একমাত্র সে আর শর্মিলা ছাড়া তাঁর গোপন অভিসারের কথা আর কারও জানার কথা নয়।

'আসতে পারি স্যার?'

রামানন্দ চোখ তুলে তাকালেন। এক পাল্লার দরজার ফাঁকে বাড়ানো মুখ-খানা নজরে এল। যদিও সেই ড্রাইভারের মুখ আজ স্পষ্ট মনে নেই, তবে এ লোক তো সেই লোক নয়।

'ইয়েস, কাম ইন।' বেশ গম্ভীর হয়েই লোকটিকে ভেতরে ডাকলেন রামানন্দ। আপাদমস্তক জ্বলে গেল তাঁর। এই রকম একজন হতকুৎসিত চেহারার লোক তাঁর চেম্বারে আসতে সাহস পায়? হাত কচলাতে কচলাতে লোকটি এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। রামানন্দর ভ্রূকুঞ্চিত হয়েই ছিল। মনে মনে তিনি ভাবছিলেন, এ লোকটা কে হতে পারে? এর সঙ্গে শর্মিলা প্যাটেলের সম্পর্কই বা কী? তবে ও প্রসঙ্গে না গিয়ে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'কে আপনি? কী চাই?'

দাঁত বের করে হাসল সোহনলাল। সামনের সারির গোটা তিনেক দাঁত নেই। বেশ বোঝা যায় নেশা করে করে দাঁতগুলোর কালচে ছোপ ধরেছে। ঠোঁট আর কসের গায়ে বাসি পানের লালচে কালো ছোপ। সারা চোখে-মুখে হায়েনার নিষ্ঠুরতা। লোকটার অসহ্য মুখটা দেখে রামানন্দর মেজাজ আরও চড়ে উঠল। প্রায় ধমকের সুরেই তিনি বললেন, 'এখেনে কী দরকার?'

'আছে স্যার। একটু বসতে বলবেন না?'

'বসার দরকার নেই, এখন আমি ব্যস্ত আছি, কিছু বলার থাকলে বলে ফেলুন।'

'নেহি সাব,' বলে, নিজেই সে চেয়ার টেনে গুছিয়ে বসতে বসতে বলল, 'আপনি কাজের মানুষ, কাজ তো করবেনই। লেকিন হামার প্রয়োজনটাও ফ্যালনা নয়, একটু সময় লিবে।'

লোকটা স্পর্ধা দেখে রামানন্দ মনে মনে আরও ক্ষেপে গেলেন। তবু তিনি যথাসাধ্য নিজেকে সংযত রেখেই বললেন, 'দরকারটা কী?'

'ওই যে, ওই স্লীপ।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আপনি শর্মিলা প্যাটেল নাকি?'

সোহনের বিশ্রী মুখ থেকে এক অদ্ভুত ধরনের খিকখিকে হাসি বেরিয়ে এল। গা জ্বালানো হাসি। হাসতে হাসতেই সোহন বলল, 'হামাকে দেখে কী জেনানা মনে হয় স্যার?'

'তাই জন্যেই তো জিজ্ঞাসা করছি, স্লীপে একজনের নাম, এলেন আপনি?'

'শর্মিলা প্যাটেলকে আপনি চেনেন না?'

'কে শর্মিলা প্যাটেল? এ নামে আমি কাউকে চিনি না।'

'দিল্লাগী করছেন স্যার? এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? রমা, রমা, যিস্‌কো দুসরা নাম শর্মিলা। একটু কিতাবি নাম না হলে বাবুদের মন ভরতো না তো।'

'আপনি ঠিক কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। না, কোন রমা বা শর্মিলা কাউকেই আমি চিনি না।'

রামানন্দ উত্তেজিত ছিলেনই। খুব সম্ভব শেষের দিকে তিনি বাক সংযম হারিয়েছিলেন, গলার স্বর সামান্য চড়িয়ে তিনি বললেন, 'আপনার আর কিছু যদি বলার না থাকে, তাহলে...'

'আইস্তা সাব, আইস্তা এত উত্তেজিত হবেন না, চিৎকার করলে, লোকজন জানাজানি হয়ে যাবে...হামি বলছি আপনি স্যার শর্মিলাকে চিনেন। যদি না পারেন, তাহলে আপনাকে মনে করিয়ে দিই, দেড় বরষ পহেলে শর্মিলা ছাড়া আপনার সাঝ বরবাদ হয়ে যেত, আউর কুছ মনে করাব স্যার?'

'স্টপ্ ননসেন্স। এটা কী গল্প করার জায়গা? না তোমার মাতলামি শোনার সময় আমার আছে?'

'ঠিক বলিয়েছেন স্যার,' কচলানো হাসি দিয়ে সোহন বলল, 'হামি মাতাল আছে। আউর মুশকিলটা হইয়েছে সেখানেই, রমা বেঁচে থাকতে হামার কোন অসুবিস্তাই ছিল না। যোখনই রূপয়ার দরকার পড়ত রমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, লছমীদেবী আমার দুহাত ভরে দিতেন। মাতাল ছিলুম তখন। লেকিন এখোন স্যার···বুকটা হুহু করে, রমা নেই···নেশাভি নেই। মাঝে মাঝে কুছ রূপয়া হাতে এলে চুল্লু-টুল্লু চলে। কালভি কোন রকমে একটু জোগাড় হইয়েছিল।'

'আমার কাছে এসেছ কেন? তোমার রমার কাছে যাও।'

'সেকী স্যার? আসমান থেকে পড়ছেন কোনো? দেড় বছর পহেলে এক সনঝে বেলায় রমা থুড়ি শর্মিলা প্যাটেল খুন হয়েছে তা আপনি জানেন না?'

'কে কোথায় মরল, কে কোথায় খুন হল, তা আমার জানার ব্যাপার নয়।'

'বাততো সোহি হ্যায়। লেকিন শর্মিলা খুনের বেপারটা যেতো না জানা যায় ততই ভাল। নাহলে··'

'নইলে?'

'নইলে, মুসিব্বত আপনারই।'

'হোয়াট?'

'চিল্লাবেন না স্যার। আপনার অফিসের লোকজন যদি সোব জানতে পারে, ঘরে সতীলক্ষ্মী জরু থাকা সত্ত্বেও দেড় বছর পহেলে আপনি এক রেণ্ডি বাড়ি সন্‌ঝে কাটাতেন, তারপর একদিন সেই মেয়েছেলেটাকে খুন করে নিপাত্তা হয়ে গেছেন, একবার ভেবে দেখুন স্যার, তোখন আপনার মান ইজ্জত, ইতো বড় ব্যবসা, ইতো লোকের খাতির, কোথায় যাবে . সে আপনিই বলুন?'

লোকটি যে অতীব ভয়ঙ্কর তা বুঝতে দেরী হল না রামানন্দর। বেশ আঁটঘাট বেঁধেই যে নেমেছে এটাও বুঝতে অসুবিধা হল না। কিন্তু লোকটা কে? তার সম্বন্ধে এত কিছু জানলোই বা কেমন করে? ড্রাইভারটা নয়। সে লোকটা ছিল বাঙালী। কিন্তু এর কথায় অন্য টান। অবশ্য গলার স্বর তিনি নরম করলেন না। জানেন এখন নিজেকে নরম করার অর্থই লোকটার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া। কিন্তু কী চায় লোকটা? তার বক্তব্যই বা কী? মোটামুটি নিজেকে স্বাভাবিক রেখেই বললেন, 'তুমি কে?'

'বহুত শরম কি বাত স্যার। বলতে লাজ আসছে। হামি স্যার রমার হাজব্যাণ্ড।'

'হোয়াট ?'

'জি সাব। কি করব বোলেন, খেটে খেতে হামার একদম ভাল্লাগে না। তার ওপর স্যার, এই ডানহাতটায় তেমন জোর পাই না। রোজগারটা রমাই করত। মাঝে মাঝে খুব শরম লাগত। জেনানার পয়সায় দিন গুজরান। লেকিন দুধেল গাই তো, যত পারা যায় দুয়ে নেওয়া, এই আর কী ?'

এই নির্লজ্জ লোকটার সঙ্গে আর কথা বলতে ভাল লাগছিল না রামানন্দর। কিন্তু ও যেভাবে চেয়ারে এঁটে বসেছে চট্ করে নড়বে বলে মনে হয় না।

'হামার নাম স্যার সোহন। সোহনলাল প্যাটেল। রমা আমার সাদি করা জরু। তো এখনো হামি বহুত বিপাকে আছি। দেড় বছর হামার কোনো ধান্দা হচ্ছে না, তো সেদিন আপনাকে গাড়িতে দেখলুম, ভাবলুম কী, হামার বিবিকে আপনি একদিন বহুত দিয়েছেন, তো আজ যদি আমাকে কুছ...'

'কুছ মানে ?'

'এমোন কিছু বেশী দিতে লাগবে না। এই ধরেন মাহিনামে একবার আসবে, দোশ হাজার করে দিয়ে দিবেন। একদম ক্যাশ দিবেন। বাস, হামার মুখ বন্ধ, আউর আপনিও যেমন আছেন তেমন থাকবেন। দুনিয়ার কোনো শালা আপনার টিকিভি ছুঁতে পারবে না।'

রামানন্দর অনেক কিছু বলার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কিছু না বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোহনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখতে লাগলেন লোকটা কদ্দুর এগোয়।

'কী স্যার, কী ভাবছেন ? হামার অবস্থা একদফে চিন্তা করেন।'

'ভাবছি তোমার মত রাস্কেলকে পুলিশে দোব না অন্য কিছু করব !'

'পুলিস ?' হো হো করে হেসে উঠল সোহন, তারপর যেন অনেক লজ্জা পেয়েছে, এমন ভাব দেখিয়ে নিমেষে হাসি থামিয়ে বলল, 'গুস্তাকি মাফ বাবুজি, লিকিন, মাহ্বলি হামাকে দশ হাজার না দিলে, ও কাজটা হামিই করব। পুলিসকে হামি জানাবে কি উস্‌দিন সন্‌ঝেবেলা আপনি শর্মিলা প্যাটেল বলে এক জেনানাকে খুন করেছেন, সে জেনানা ছিল আপনার কেপ্ট। লেকিন, পুলিসকে জানানোর আগে হামি যাবে আপনার বিবির কাছে। সতী মাইয়ার কাছে আউর কুছ্ বাতাবে... আউর থোড়া থোড়া কামভি করবে—। উসোব হামি এখন বাতলাবে না।'

রামামন্দ সোহনের লেখা চিরকুটটা তুলে নিলেন। তারপর সেটিকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দিলেন। ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর ততোধিক ধীরে ধীরে বললেন, 'বুঝলে সোহন, তোমার কয়েকটা কথা জানা দরকার। তুমি খুব ভুল জায়গায় এসেছ। শর্মিলা বা রমা বলে

কাউকে আমি চিনি না। কোনোদিন দেখিওনি। এই শহরে আমি একটা বড় ব্যবসা করি। তোমার মত ব্ল্যাকমেলার আমার অনেক দেখা আছে। তোমাদের কী করে টিট করতে হয় সেটাও আমার জানা আছে। নাউ, গেট আউট অফ মাই সাইট। একটা নয়া পয়সাও তোমাকে আমি দোব না। আর শোন, ফারদার যদি কোনদিন তোমাকে আমার সামনে আসতে দেখি, আই উইল গো এক্সট্রিম ফর ইট। নাউ, লীভ দিস রুম।'

রামানন্দর কথা শুনে সোহন হাসল আর সেই বিচ্ছিরি দাঁত বের করে। তারপর দুদিকে হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। একটা লম্বা হাই তুলে বলল, 'আপনার পেন আউর প্যাডটা দিবেন স্যার?'

'হোয়াই?'

হোয়াই-এর কোনো উত্তর না দিয়ে সোহন নিজেই তুলে নিল একটা ডট্‌পেন। তারপর টেবিলে রাখা ডেট ক্যালেণ্ডারের সাদা পাতায় একটা টেলিফোন নম্বর লিখে রামানন্দর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'একঠো ফোন নাম্বার দিয়ে গেলাম। দুদিন সময়ভি দিলাম। ঠাণ্ডা ত্‌বিয়তে সোব কুছ ভাল করে চিন্তা করে দেখবেন। তারপর হামাকে ফোন করে জানিয়ে দিবেন আপনি কী করবেন, কী করবেন না। লেকিন ইয়াদ রাখবেন, আপনি একজন বিজনেস ম্যাগনেট আছেন, বাড়িতে আপনার জরু আছে, আপনার প্রেস্টিজ আছে, খুনের আসামী হতে কী দিল চাইবে? না না, এতো তাড়াতাড়ি না। ফরটি এইট আওয়ার্স সময় আপনার হাতে আছে। ভাবেন, ভাবেন, এখোন হামি যাচ্ছে।'

কলে ধরা পড়া ইঁদুরের মত রামানন্দকে নিজের চেম্বারে রেখে দপদপিয়ে চলে গেল সোহনলাল। রামানন্দর মুখ থেকে একটা অশ্লীল ভাষা বেরিয়ে এল, 'ব্লাডি, বাস্টার্ড।'

সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ইদানীং নীলের কবিতা পড়ার দিকে ঝোঁক চেপেছে। তাও আবার আধুনিক কবিতা। হাতে কোনো কাজটাজ না থাকলে অবসর সময় কাটায় কবিতা পড়ে। আধুনিক কবিতা আর মডার্ন ফাইন আর্টস্ নিয়ে অনেক বিরূপ কথাবার্তা ওর কানে এসেছে। সেগুলো কতটা সঠিক সেইটুকু যাচাই করার জন্যে মাঝে মাঝে ও অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্-এর প্রদর্শনী-

গুলোয় ঢুঁ মারে। ছবি দেখে বুঝতে চেষ্টা করে শিল্পী কী বলতে চেয়েছেন। কখনও রস গ্রহণ করতে পারে। কখনও সত্যিই দুর্বোধ্য রয়ে যায়। আধুনিক কবিতাও সেই উদ্দেশ্যে পড়া। কিছু কিছু কবিতা বেশ কয়েকবার পর কিছুটা বোধগম্য হয়। আবার কখনও সত্যিই কিছু বুঝতে পারে না। জটিল রহস্যের মত। শব্দ নিয়ে কবি যেন পাঠকের সঙ্গে রহস্যময় খেলায় মেতেছেন।

আজও একটা শব্দের চাতুরীর মধ্যে যখন ও গভীরভাবে ডুবেছিল হঠাৎ দীনু এসে খবর দিল কে একজন বাবু দেখা করতে এসেছে। কোনো ক্লায়েন্ট হতে পারে এই ভেবে সে বলল, 'যা ডেকে নিয়ে আয়।'

একটু পরেই শ্যামদুলাল ঘরে ঢুকল, 'আমি নীলাঞ্জন ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'হ্যাঁ আমিই, বসুন।'

সামনের চেয়ারে উপবেশন করতে করতে শ্যামদুলাল বলল, 'আমার নাম শ্যামদুলাল দত্ত। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।'

নীল মৃদু হেসে বলল, 'প্রয়োজন ছাড়া আমার কাছে খুব কম লোকই আসে। নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছেন?'

'আজ্ঞে না। বিপদের একটা ব্যাপার আছে। তবে সেটা ঠিক আমার নয়।'

'কী রকম?'

'একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, তার আগে জিজ্ঞাসা করি, আপনার ফীজ কী রকম?'

'আগে আপনার ঘটনাটা শুনি।'

'ব্যাপারটা কী জানেন, আমি হয়ত পুলিসে যেতে পারতাম, অথবা একদম চুপ করে থাকতে পারতাম, কিন্তু মনে হল, কাউকে জানানো দরকার। কোনো রেসপনসিব্‌ল্‌ লোককে। আপনার নাম আমি শুনেছি। খবরের কাগজেও আপনার রহস্য সমাধানের খবর পড়েছি। আর সত্যি কথা বলতে কী, পুলিসে আমার বড় ভয়। এতো টানা হেঁচড়া! সুস্থ জীবন তখন অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'আপনি বলুন, আপনার সমস্যাটা কী?'

'আগেই বলেছি, সমস্যাটা আমার নয়, তবে সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে, কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি তাই।'

এরপর শ্যামদুলাল সামান্য সময়ের বিরতি নিল। তারপর বলল, 'আমি একটু অল্প বয়সেই চাকরিতে ঢুকেছি। প্রায় বছর পঁচিশ হল আমি ঘোষ কেমিক্যালসের চাকুরে। বর্তমানে কোম্পানীর অ্যাকটিভ ডিরেক্টর্‌ মিঃ রামানন্দ বাসুর পি. এ.।

এমনিতে সব ঠিকই ছিল। আমার বস্ খুবই ভালো লোক। মাইনে টাইনেও বেশ ভালো। কিন্তু··· ?'

'কিন্তু ?'

'আপনার মনে আছে কিনা জানি না, প্রায় বছর দেড়েক আগে, পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের এক ফ্ল্যাটে শর্মিলা প্যাটেল নামে এক মহিলা রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছিলেন। সেইসময় কাগজেও বেশ কিছুদিন এ ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ হয়েছিল, তারপর ·'

শর্মিলা প্যাটেলের নাম শুনে নীল বেশ নড়েচড়ে বসল। কয়েকদিন আগেই বিকাশ তালুকদারের সঙ্গে তার এ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। তারপর আজ হঠাৎ এই ভদ্রলোকের মুখে সেই নাম শুনে স্বাভাবিক কারণে নীলের ভাবান্তর ঘটল। সে বেশ উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'শর্মিলা প্যাটেলকে আপনি চেনেন ?'

'আজ্ঞে না। কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটায় ঐ নামটা আমায় ভাবাচ্ছে।'

'কী রকম ?'

'তবে শুনুন' এই বলে শ্যামদুলাল তাঁর কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ক্যাসেট বার করল। তারপর বলল, 'জানি, কাজটা খুবই অন্যায়। অন্তত আমার বস্ যদি এটা জানতে পারেন তাহলে আমার চাকরি নট্। ক্যাসেটটা আমায় কালই ফেরৎ নিয়ে যেতে হবে। কারণ ঘটনাটা ঘটেছে আজই দুপুরে। খুব সম্ভবত উত্তেজিত থাকায় এই ক্যাসেটের ব্যাপারটা ওনার খেয়াল ছিল না। নিশ্চয়ই কাল সকালে এসেই উনি ক্যাসেটের খোঁজ করবেন। কাল সকালে গিয়ে আমাকে এটা যথাস্থানে রেখে দিতে হবে। এটা এখুনি আপনাকে শোনাতে চাই। নিশ্চয়ই রেকর্ডার আছে ?'

'হ্যাঁ, তা তো আছেই। কিন্তু ক্যাসেটের ব্যাপারটা কী ?'

'মিঃ বাসুর ঘরে একটা অদৃশ্য মাইক্রোফোন থাকে। অনেক সময় অনেক কথার নোট রাখতে হয়। হয়তো কোনো পার্টি কোনো কথা পরে অস্বীকার করতে পারেন অথবা কথাবার্তা চলাকালীন কী কী কথা হয়েছিল তা পরে মনে নাও থাকতে পারে, এইসব নানা কারণে ঐ মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা। আজ দুপুরে একজন অদ্ভুত ধরনের লোক আমার বসের সঙ্গে দেখা করতে আসে। লোকটি পার্সোন্যালি বসের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কিছু কথাবার্তা চালায়। আমি বসি আমার বসের লাগোয়া কামরায়। আমার ওপর ইনস্ট্রাকশন দেওয়াই আছে। কোনো অচেনা বা বিশেষ কোনো লোক এলেই টেপ চালানোর। বলাবাহুল্য টেপ মেসিনটা

থাকে আমার ঘরেই। আজও চালিয়েছিলুম, শুনুন এটা।'

নীল ওর টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে এল। ক্যাসেটটা ভরে চালিয়ে দিল। খুব মনোযোগ দিয়ে ও সোহন আর রামানন্দর বাক্যালাপ শুনল। শুনতে শুনতে একটা অদ্ভুত পুলকে ওর সর্বাঙ্গে একটা শিহরনের স্রোত বয়ে গেল। দেড় বছর আগের এক অন্ধকারে জমে থাকা রহস্যের ওপর কে যেন ধীরে ধীরে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। উত্তেজনায় ওর শরীর টান টান হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল বিকাশ তালুকদার যদি এই টেপটা শুনত তাহলে নির্ঘাত শ্যামদুলালবাবুকে আতিশয্যে একটা চুমুই খেয়ে ফেলত। নীল অতটা করল না। কারণ ওর আবেগ আর আতিশয্যের প্রকাশ অন্যরকম। টেপটা শেষ হতে ও রেকর্ডার থেকে টেপটা তুলে নিয়ে বলল, 'আপনি ফীজের কথা বলছিলেন না? আপনাকে কিছু দিতে হবে না। কেসটা আমি অ্যাকসেপ্ট করছি। তবে আর একটা উপকার করতে হবে।'

শ্যামদুলাল একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'উপকার মানে?'

'আমি আপনার ক্যাসেট থেকে একটা রিটেক করতে চাই।'

'কিন্তু?'

'সংশয় কিসের?'

'আমার অফিস সংক্রান্ত নিয়মে কাজটা বেআইনী।'

'কিন্তু আমার কাছে এসেছেন বিবেকের তাড়নায়। দেড় বছর আগের এই মিস্টিরিয়াস খুনের ব্যাপারটার আজও সমাধান হয়নি। আমার মনে হচ্ছে এই ক্যাসেট আমাদের কিছু সূত্র দিতে পারে। একটা অনাবিষ্কৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক এটাই তো আপনি চান?'

'কথাটা ঠিক। কিন্তু আমার আসার আর একটা বড় কারণ সোহনলাল লোকটা হঠাৎ আমার বসের কাছে এলো কেন? আর কেনই বা মিঃ রামানন্দ বাসুর মত লোককে সে ঐসব কথা বলতে সাহস পেলো? যদিও মিঃ বাসু লোকটাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু হুট বলতে কেউ একজন এসে এভাবে চার্জ করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে কোন্ যুক্তিতে এটাও তো জানার দরকার। অবশ্য যদি আপনি এটাকে পরচর্চার পর্যায়ে ফেলেন তাহলে আলাদা কথা।'

'না শ্যামদুলালবাবু, সত্যকে জানতে গেলে মাঝে মাঝে পরচর্চা করতেই হয়। বিশেষ করে আমাদের, যারা গোয়েন্দাগিরি করি। যাইহোক, আপাতত আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সত্যের খাতিরে আপনি সঠিক উত্তর দেবেন নিশ্চয়ই?'

'সেই জন্যেই তো আসা।'

'আচ্ছা, রামানন্দবাবু লোকটা কেমন?'

'ভাল, তবে বেশ কড়া ধাঁচের লোক। বিশেষ করে অফিসের ব্যাপারে কোনো ঢিলেমী উনি পছন্দ করেন না।'

'ওনার সম্বন্ধে নারী ঘটিত কোনো দুর্বলতার কথা আপনার জানা আছে?'

শ্যামদুলাল এ কথার সহসা কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে কিছু ভাবল। তার একবার মনে হল দেড় বছর আগের সেই বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যার সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে। কিন্তু পরমুহূর্ত, অথবা নিজের জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা ভেবে ও প্রসঙ্গ তুলল না। তাছাড়া একটা বিশেষ জায়গা পর্যন্ত তার সব কিছু মনে আছে। তারপরই সব অন্ধকার। কেন এতদিন পুলিশে সে একথা জানায়নি, তারও কোন সদুত্তর সে দিতে পারবে না। অনেক ভেবে চিন্তে কিছুটা সময় নিয়ে তারপর বলল, 'ওনার জীবনে একটা ট্র্যাজিডি আছে। সেটি ওনার স্ত্রীর দিকে। যদিও শিবানী দেবীই আমাদের কোম্পানির মালকিন, এবং আমার যতদূর জানা, শিবানী দেবীকে বিয়ের পরই রামানন্দবাবু কোম্পানির ডাইরেক্টর হন। তবে ব্যক্তিগত জীবনে উনি ওনার স্ত্রীকে নিয়ে অসুখী এবং অতৃপ্ত।'

'কি রকম?'

এরপর শ্যামদুলাল ওর জানা অনুযায়ী রামানন্দ এবং শিবানীর বিবাহিত জীবনের সব কমপ্লেক্সের কথা তুলে ধরল। জানাল মানুষ হিসেবে শিবানী দেবী ঠিক কেমন তা তার জানা নেই, তবে ঐরকম একজন বিশালাকার মহিলাকে নিয়ে কেউ দাম্পত্যজীবনে সুখী হতে পারে না।

'রামানন্দবাবুর বাহ্যিক জীবনে কী তার কোনো প্রতিফলন দেখেছেন?' নীলই প্রশ্নটা করল।

'নইলে আর রামানন্দবাবুকে নিয়ে নানান কথা হবে কেন?'

'নানা কথা মানে? কী কথা?'

'খুব সম্ভবত ওনার নারী ঘটিত কোনো দুর্বলতা ছিল বা আছে।'

'শর্মিলা প্যাটেল সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা নেই?'

হঠাৎ চমকে উঠল শ্যামদুলাল। তারপর বেশ জোর দিয়েই বলল, 'না।'

শ্যামদুলালের চমকানি কিন্তু নীলের নজর এড়ালো না। সেটা অবশ্য বুঝতে না দিয়ে ও বলল, 'আপনার কী মনে হয় সোহনলালের অভিযোগ সত্যি? আই মীন, রামানন্দবাবু কী শর্মিলাকে খুন করতে পারেন?'

'এসব ক্ষেত্রে একদম বাইরে থেকে হলফ করে কিছুই বলা যায় না। মানুষ

বিপাকে পড়লে অনেক কিছু করতে পারে। হয়তো রামানন্দবাবু এমন কোনো অবস্থায় পড়েছিলেন, যাতে করে ইচ্ছে না থাকলেও উনি বাধ্য হয়ে খুন করে-ছিলেন।'

'অর্থাৎ রামানন্দবাবু প্রয়োজনে খুন করতে পারেন?'

শ্যামদুলাল কিছু না বলে চুপ করে থাকে। ঘাড় নাড়তে-নাড়তে নীল বলে, 'হুঁ। আচ্ছা, ওনার স্ত্রীকে কী উনি ভয় করেন?'

'পৃথিবীর সব স্বামীই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের স্ত্রীদের বোধহয় ভয় করেন। মানে, কোন একটা বইতে বোধহয় পড়েছিলাম একথাটা।'

'এনিওয়ে, সোহনের দেওয়া ফোন নাম্বারটা জেনেছেন?'

'না। ওটাতো ও মুখে বলেনি, কাগজে লিখে দিয়েছিলো।'

'ফোন নাম্বারটা জরুরী। কালই অফিসে গিয়ে খোঁজ করবেন। আপনার অসুবিধে নেই। আপনি তো ওনার পি. এ। একটু অপেক্ষা করুন। অফিস থেকে তো ডাইরেক্ট ফিরছেন। চা জলখাবার খান। আমি ততক্ষণে রিটেকিংটা সেরে ফেলি। ভয় নেই, বিশেষ প্রয়োজন না হলে এটা ব্যবহার করব না।'

নীল পাশের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে চা জলখাবার এসে গেল। মিনিট কুড়ি পর নীল ফিরে এসে অরিজিন্যাল ক্যাসেট ফেরৎ দিতে দিতে বলল, 'আপনার কোঅপারেশনের জন্যে ধন্যবাদ। কোনো নতুন খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। সোহনলাল এলেই খবরটা দেবেন। এই আমার ফোন নাম্বার।'

শ্যামদুলালের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠব উঠব ভাব, নীল সোফায় বসতে বসতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা শ্যামদুলাল বাবু, ঘোষ কেমিক্যালসে আপনার চাকরি কদ্দিন?'

'অনেক দিনের। তা আপনার রামানন্দ বসুর আগে থেকেই। ও তো আমার অনেক নিচু পোস্টে ঢুকেছিলো।'

নীলের মুখে ফিকে হাসি। ধীরে ধীরে ও বলল, 'এক লাফে সবাইকে টপ্‌কে কেউ গাছে উঠলে, অন্যরা চায় তার মইটা কেড়ে নিতে ...তাই না?'

অদ্ভুত প্রশ্নে শ্যামদুলাল থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার প্রশ্নটার ঠিক অর্থ বুঝলাম না।'

'অ্যাঁ, না কিছু না।'

'তাহলে আজ আমি—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। সোহনলালের খবরটা কিন্তু জরুরী'।

'সে আর বলতে—' শ্যামদুলাল উঠে পড়ে। যেতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে

প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা 'নীলাঞ্জনবাবু, আপনার কী মনে হয় সত্যিই শর্মিলাকে রামানন্দবাবু খুন করেছিলেন ?'

হাসতে হাসতে নীল বলল, 'আপনিও যেখানে আমিও সেখানে। তবে একটা কিছু ধরার মত অবলম্বন যখন পাওয়া গেছে তখন আসল খুনী ধরা পড়বেই।'

সোহনলাল চলে যাবার পর সেই যে রামানন্দ গুম হয়ে গিয়েছিলেন তারপর থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা একটা বোবায় পাওয়া অবস্থা। সারাদিন অফিসে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শ্যামদুলালকে জানিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন আর কারো সঙ্গে তিনি কোনো কথা বলবেন না। কেউ দেখা করতে এলে সে যেন বলে দেয় সাহেব খুব ব্যস্ত। অন্যদিন যেন আসে।

আসলে সোহনলাল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেড় বছরের পুরনো ভয়টা ধীরে ধীরে তাঁকে বশ করে ফেলেছিল। দেড় বছর ধরে ফিরে পাওয়া শক্তিটা যেন নিমেষে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সেই বীভৎস রাতটা তাঁকে সমানে কসাঘাত করে চলল। ফাইলগুলো টেনে নিয়ে বসতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন মনটাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু ভয় জিনিসটা এমনই, তাকে জোর করে ছাড়াতে চাইলেও সে ছাড়ান দেয় না। পুরনো ব্যাধির মত সুযোগ পেলেই চেপে বসে।

শর্মিলা প্যাটেল। অসামান্যা রূপসী। প্রথম আলাপ এক পার্টিতে। সবার নজর কাড়া মেয়েটা রামানন্দকেও আকৃষ্ট করেছিল। আর পাঁচজনের মত তিনিও বারবার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়েটির দিকে। অবশেষে একসময় মেয়েটি নিজেই এগিয়ে এসে আলাপের সূত্রপাত করেছিল।

রামানন্দর ধারণায় ছিল না একটি সুন্দরী মহিলার সান্নিধ্য কত মনোরম হতে পারে। তার ভাঙা বাংলায় আধো আধো বুলি, মিষ্টি হাসি, চোখের কোণে মন অবশ করা চাহনী আর উচ্ছল যৌবনের বর্ণাঢ্য সুষমা রামানন্দকে পাগল করে দিয়েছিল সেই এক সন্ধ্যাতেই। এর ওপর ছিল সুরার মদিরতা।

রামানন্দ ভেসে গিয়েছিলেন। ভাসাই স্বাভাবিক। প্রথম জীবনে তিনি চেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠা। চেয়েছিলেন অর্থানুকুল্য। একসময় সবই পেয়েছিলেন। হয়েছিলেন একটি কোম্পানীর ডিরেক্টর। ইচ্ছেমত খরচ করার টাকা, গাড়ি বাড়ি সবকিছু। কিন্তু তার জন্যে বিসর্জন দিতে হয়েছিল জীবনের আর এক দিক।

নিজের হাতেই নিজের যৌবনকে তিনি কবরস্থ করেছিলেন। শিবানীর মত এক আপাত অচল মহিলাকে বিয়ে করে যৌবনের মহাস্বাদ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। হয়তো এমনি ভাবেই দিন কেটে যেত ব্যবসার নেশায়। টাকায় নেশায়। কিন্তু তা কাটল না। যৌবনকে অস্বীকার করা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পক্ষেও সম্ভব নয়। চল্লিশের দোরগোড়ায় এসে তিনি বুঝলেন জৈব যন্ত্রণা তাঁর সমস্ত অতৃপ্তি নিয়ে হাহাকার করে চলেছে। দুগ্ধ ফেননিভ নিভাঁজ শয্যায় অনেক রাত-বিনিদ্র কেটেছে। চঞ্চল হয়েছেন একটি নারী দেহের কামনায়। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন পাশের খাটে শুয়ে আছে শিবানী। একটি বিশাল মেদ-চর্বি সর্বস্ব বিশাল অবয়বমাত্র। ঘুমের তালে তালে তার সর্বাঙ্গ উঠছে নামছে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যেও ইচ্ছাবোধ জাগরিত হয়নি, চর্বি-মাংসের ঐ বিশাল পিণ্ডাকার দেহটি ছুঁয়ে দেখতে। সমস্ত কামনা নিমেষে অন্তর্হিত হয়েছে। তাঁকে নিক্ষেপ করেছে মহাশ্মশানের শূন্যতায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়েছেন। কতদিন ভেবেছেন এ কোন্ জীবন তিনি অতিবাহিত করে চলেছেন? যে অর্থের কামনায় তিনি জীবনের এক মহাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত, তাই কী তিনি নিজের মত করে পেয়েছেন? এই যে দিনরাত ব্যবসার কথা ভাবেন, তাও তো তাঁর নিজের নয়। সেখানেও যে চরম পরাধীনতা।

ভবেশ ঘোষের উইলের শর্ত মানলে সে শিবানীর ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নয়। শিবানী তাকে ইচ্ছামত খরচের স্বাধীনতা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি খরচের জন্যে তাকে পরোক্ষে জানাতে হয় এ খরচ কি জন্যে? পরের ধনে পোদ্দারি করলে যার ধন তাকে তো কৈফিয়ৎ দিতেই হবে।

না শিবানী তাঁকে কখনোই কোন প্রশ্ন করে না। শিবানীর সে স্বভাবই নয়। কেবলমাত্র ফুলশয্যার রাতেই যা শিবানী অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলেছিল। তারপর থেকে বিনা প্রয়োজনে তো নয়ই, প্রয়োজনে কেবল মাত্র প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্যেই তার বাক্য খরচ।

দিন পনেরো অন্তর সে একবার করে হিসাবপত্রের খাতায় চোখ বোলায়। যদিও সে কাজের জন্যে অ্যাকাউনট্যাণ্ট আছেন, অডিট আছে তবু সে একবার করে অবশ্যই হিসাব দেখবে। কোন কারণে যদি বেশি চেক-টেক কেটে ফেলেন রামানন্দ, শিবানী একবার তার সেই অদ্ভুত ভাবলেশহীন চোখ তুলে কেবল তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে যায়। রামানন্দকে তখন বলতেই হয় চেকটা কী কারণে কাটা হয়েছে। অথচ রামানন্দ বুঝতে পারেন স্বামী হিসেবে শিবানী তাঁকে ভালবাসে। তাঁর প্রতিটি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে শিবানীর কড়া নজর। দাসদাসীদের হাতে নয়, নিজের হাতে সে স্বামীর পরিচর্যা

করে। রামানন্দ কী খাবেন, কোন গাড়ি চেপে অফিসে যাবেন। কোন স্যুট তিনি কবে পরবেন, কোন স্যুটের সঙ্গে কী টাই ম্যাচ করবে, সব কাজই সে নিজে করাবে। মাসান্তে একবার করে ডাক্তার আসবে। হবে টোট্যাল চেকআপ।

চল্লিশ ছুঁই ছুঁই রামানন্দর জীবন যখন প্রায় অতিষ্ঠ, মাঝে মাঝে যখন তিনি ভেবে ফেলতেন এভাবে কোন সুস্থ পুরুষ মানুষের বাঁচা সম্ভব নয়, ঠিক তখনই দেখা শর্মিলা প্যাটেলের সঙ্গে। গুমোট ঘরে দমকা হাওয়ার মত শর্মিলা তাঁর সব কিছু এলোমেলো করে দিল। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের এক উদ্ভিন্নযৌবনা। চোখে মুখে এক অনাবিল আকর্ষণ। জীবনে আর এক অন্য স্বাদ এল। যে স্বাদ প্রায় চল্লিশ পর্যন্ত অনাস্বাদিত। তাঁর মধ্যে ঘুমন্ত যৌবন উদ্দাম হয়ে উঠল। তাঁর অস্থির অবদমিত বাসনা সাগরের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল শর্মিলার যৌবনদীপ্ত বেলাভূমিতে। এত অপার আনন্দ যে এক নারীর শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে এ বোধ তাঁর ছিল না। চল্লিশের আনন্দে তিনি ভাবলেন শর্মিলা তাঁর জীবনে না এলে জীবনের এক মহাজ্ঞান তাঁর অগোচরেই থেকে যেত।

মানুষ যখন উদ্দাম চলায় মেতে ওঠে তখন আর তার আশপাশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। আসলে সে তখন অন্য কিছু তাকিয়ে দেখতে ভালবাসে না। তা যদি পারত তাহলে রামানন্দ দেখতে পেতেন তাঁর অফিস কর্মচারীদের মধ্যে তখন রীতিমত গুঞ্জন উঠেছিল রামানন্দকে ঘিরে। অবশ্যই কেউ এনিয়ে কোন প্রকাশ্য রসালাপে মত্ত হত না।

এমনি করেই কোথা দিয়ে যেন বছর দেড়েক কেটে গিয়েছিল। শর্মিলার জন্যে একটা বিরাট অঙ্ক প্রতিমাসে খরচ হত। শিবানীর নীরব জিজ্ঞাসাকে ব্যক্তিগত খরচ বলে পাশ কাটাতেন মরিয়া হয়ে। শর্মিলার প্রেমে তিনি তখন এতই মশগুল ছিলেন, শিবানীর ভাবাভাবির দিকে ফিরে তাকানোর তাঁর অবসর ছিল না। অবশ্য শিবানীও তার স্বভাবজাত কারণে কোনদিনও রামানন্দকে কোন প্রশ্ন তুলে বিব্রত করেনি। কিন্তু হঠাৎই সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। দেড় বছর আগে, এক বৃষ্টিঝরা রাতে তাঁর সব হিসেব পাল্টে গেল।

শর্মিলা বারবনিতা হলেও তার রূপ, তার ব্যবহার, তার প্রাণ উদ্বেল করা মোহময়ী আকর্ষণ রামানন্দকে অন্ধ করেছিল। বোধহয় তিনি শর্মিলাকে ভাল-টালোও বেসেছিলেন। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল শর্মিলাকে এক সন্ধ্যায় না দেখলে তাঁর মন খারাপ হয়ে যেত। শর্মিলার সঙ্গ তখন তাঁর নিত্যদিনের সন্ধ্যা-সুখ।

দেড়বছর আগের সেই সন্ধ্যেটা আজো মনের মধ্যে দগদগ করে জ্বলছে। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। আর বৃষ্টিটৃষ্টি প্রেমিকদের একটু উদ্বেল

করেই। চেম্বারে বসে কাজ করতে করতেই তার মনে হচ্ছিল শর্মিলার কাছে ছুটে যেতে। শর্মিলার ফ্ল্যাটে যাবার কোনো বাধাই ছিল না। শর্মিলা তখন তাঁর কেনা বাঁদী। রামানন্দ জানতেন শর্মিলা উঁচুদরের দেহপসারিণী। তাতে তাঁর সুবিধাই হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে শর্মিলার চুক্তি ছিল শর্মিলা আর কোনো পুরুষকে সঙ্গ দেবে না। তার জন্য তার যাবতীয় খরচ বহন করবেন রামানন্দ। চুক্তি খরচের বাইরেও অনেক খরচ করতেন তিনি শর্মিলার জন্য। সেটা ভাল-লাগার উপরি দান। ফ্ল্যাটের দুটো চাবি। একটা থাকত শর্মিলার কাছে অন্যটা রামানন্দ রাখতেন নিজের কাছে।

দুপুরের ইচ্ছেটা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন সন্ধ্যে পর্যন্ত। তারপর শ্যামদুলালকে ছুটি দিয়ে, কিছুক্ষণ পর গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নিজের গাড়ি নিয়ে। নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে নিজের গাড়িটি রেখে বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলেন পূর্ব নির্দিষ্ট একটি গাড়ি বারান্দার নিচে। যেখানে প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া করা ট্যাক্সিটি এসে দাঁড়িয়ে থাকত।

সন্ধ্যের পরই বৃষ্টিটা নেমেছিল মুষলধারে। প্রায় মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হয়েছিল ট্যাক্সিওয়ালার জন্যে। যা সে কোনদিনই করত না। বৃষ্টির জন্যেই সে আটকে পড়েছিল। লোকটির সঙ্গে বেশী কথা না বাড়িয়ে তিনি সোজা চলে এসেছিলেন সেই ম্যানশনে।

বৃষ্টির জন্যেই হোক আর যে কারণেই হোক, ম্যানশনের আশেপাশে তখন কোনো লোকজন ছিল না। এমনিতেই জায়গাটা নির্জন। তায় বৃষ্টি। অবশ্য লিফট্ ছিল। কিন্তু সেলফ্ অপারেটেড লিফ্ট তিনি পারত পক্ষে এড়িয়েই চলেন। সিঁড়ি ভেঙে খুব স্বচ্ছন্দ মনেই তিনি ওপরে উঠে গেলেন। সিঁড়ির ডান দিকে বারো নম্বর ফ্ল্যাট। সমস্ত ফ্ল্যাটেরই দরজা তখন বন্ধ। কেবল সামান্য কিছু দূরে দূরে টিমটিমে আলো জ্বলছিল। স্পষ্ট মনে আছে, ওই দেড় বছর পরেও, দুপাশে সারি সারি ঘর, মধ্যে টানা করিডর, কোথাও একজন মানুষেরও সেখানে উপস্থিতি ছিল না। এমনকি কোনো চাকরবাকরও না। অভ্যাসমত বারো নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে বৈদ্যুতিক নবে আঙুলের চাপ দিলেন। অন্যদিন একবার কী দু'বার বেল টিপলেই রঙিন হাউসকোট পরা হাস্যমুখী শর্মিলা এসে দাঁড়াতো। তারপর নিজের হাত দুটো বাড়িয়ে রামানন্দর দু'হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে যেতো। কিন্তু বারবার তিনবার বেল টিপেও সেদিন কোনো সাড়াশব্দই পান নি। একটু বিস্মিত হয়েছিলেন রামানন্দ। তাঁর সঙ্গে শর্মিলার দেড় বছরের ঘনিষ্ঠ জীবন। একদিনের জন্যেও মেয়েটি তাঁর সঙ্গে কোনো চুক্তির খেলাপ করেনি। বরং অনেক-

দিনের পুরনো সাধ্বী-স্ত্রীর মতো তাঁর সেবা যত্ন করত, আদর আপ্যায়ন জানাত।

আরো বারকতক বেল বাজানোর পরও যখন দরজা খুলল না, তখন বাধ্য হয়েই তিনি নিজের কাছে রাখা ডুপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে গিয়েছিলেন। সাজানো গোছানো ঝকঝকে ডাইনিং স্পেস। উজ্জ্বল নিওনের আলোয় চারদিক ঝকমক করছে। কোথাও কোনো মালিন্যের ছাপ ছিল না। টু-রুমস্ ফ্ল্যাট। একটা ঘর ছিল ভেজানো। সে ঘরে কোনো আলোও জ্বলছিল না। ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, স্পষ্ট মনে পড়ে তিনি শর্মিলার নাম ধরে ডেকেছিলেন। কিন্তু কোনো ঘর থেকেই কোনো সাড়া আসেনি। স্বাভাবিক কারণেই দ্বিতীয় শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দরজা ভেজানো ছিল। চাপ দিতেই খুলে গিয়েছিল।

প্রথমটা কিছুই চোখে পড়েনি। ঘরের মধ্যে ঢুকে আরো একবার তিনি শর্মিলাকে নাম ধরে ডেকেছিলেন। সাড়াশব্দ না পেয়ে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে আসল দৃশ্যটা চোখে পড়েছিল। আঁতকে উঠেছিলেন। প্রথমটা তাঁর বিশ্বাসই হয়নি। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে সব শেষ। খুব কাছ থেকেই কেউ তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। সারা পিঠ রক্তাক্ত। একপাশে কাত হয়ে থাকা শর্মিলার সুন্দর মুখে মৃত্যু যন্ত্রণার কালো ছায়া।

ঘটনার আকস্মিকতায় কয়েক মুহূর্তের মতো তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর কী করা উচিত। প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলেন টেলিফোনের কাছে। কিন্তু ফোন তোলার আগেই তার মনে হয়েছিল, একী বোকামীর কাজ তিনি করতে যাচ্ছিলেন? ডাক্তারকে খবর দেবেন? না পুলিশকে? কিন্তু তিনি খবর দেবার কে? পুলিশ বা ডাক্তার এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে তাঁর পরিচয়। মৃতার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? তাঁর তো জবাব দেবার মত কিছু নেই। শর্মিলার সঙ্গে তাঁর তো কোনো সামাজিক পরিচয় নেই। আসল সম্পর্ক যখন জানাজানি হয়ে যাবে কলঙ্কে মাথা হেঁট তো হবেই, উপরন্তু খুনের কেসে জড়িয়ে পড়বেন।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আলো নিভিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এসেছিলেন। বেরুবার আগে উঁকি দিয়ে করিডোরটা দেখে নিয়েছিলেন। না কেউ নেই। দরজা টানতেই লক হয়ে গিয়েছিল। ইয়েল লক। তারপর অতি সতর্কতায় সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছিলেন নিচে। রাস্তায় তখন মুষলধারে বৃষ্টি। গায়ে বর্ষাতি তো ছিলই। এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিতে চেপে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে পার্কিংজোন থেকে নিজের গাড়িতে চেপে বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘোরাঘুরির পর একসময়ে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে চলে গিয়েছিলেন

সোজা নিজের বাড়ি।

না, সেখানেও কোনো বিসদৃশ ঘটনার কথা তার মনে পড়ছে না। রোজকার নিয়মেই সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। বাড়ি ফিরে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলেন। রাত প্রায় পৌনে দশটা।

বর্ষাতিটা খুলে রেখে দোতলায় গিয়ে দেখেন শিবানী নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। তার দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিলেন, 'গা হাত পা মুছে এসো। নইলে জ্বরটর হতে পারে। কফি করব?'

'না থাক। আজ একটু ..', বলে তিনি বাথরুমে চলে গিয়েছিলেন। তারপর একসময় রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছিলেন। যদিও সে রাত্রে তার কোনো ঘুমই আসেনি। সারারাত শয্যায় এপাশ ওপাশ করেছিলেন। বার বার মনে পড়ছিল মৃত শর্মিলার কথা। বার বার মনে হচ্ছিল তিনি না ফেঁসে যান। একমাত্র তাঁর ভেজা বর্ষাতির গা বেয়ে নেমে আসা বৃষ্টির জল আর গাম্বুটের ছাপ ছাড়া অন্য কোনো নিদর্শনই তিনি শর্মিলার ঘরে ফেলে আসেন নি। আচ্ছা, বৃষ্টিতে কী পুলিসের কুকুরের ঘ্রাণশক্তি কাজ করে? তা যদি না করে তাহলে পুলিসের সাধ্য নেই তাঁর কাছে আসার। এক যদি না ট্যাক্সি ড্রাইভারটা খুনটুনের খবর শুনে পুলিসে রিপোর্ট করে। অবশ্য রামানন্দর সঠিক ঠিকানা তারও জানা নেই। রাস্তাতেই কনট্যাক্ট রাস্তাতেই হিসেব নিকেশ শেষ।

সে রাত্রে রামানন্দর ঘুম আসেনি আরো একটা কারণে। তিনি নিশ্চিত জানেন, শর্মিলাকে তিনি খুন করেননি। শর্মিলার জন্যে তাঁর হৃদয় ছটফট করত। তাঁর অতৃপ্ত জীবনকে শর্মিলা ভরিয়ে দিয়েছিল তাঁর কার্পণ্যহীন যৌবনের ডালি সাজিয়ে।

না, শর্মিলাকে তিনি খুন করেননি। করতে পারেন না। তাহলে কে তাকে খুন করল?

পরের দেড় বছরে শর্মিলার স্মৃতি অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছিল। মাঝে মাঝে মধুর স্মৃতির রেশটুকু তাঁকে রোমাঞ্চিত করত। একটা অযাচিত বিপদের হাত থেকে ত্রাণ পেয়ে তিনি আবার নবোদ্যমে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের পুরনো জীবনে। না, শিবানীও তাঁকে কিন্তু সন্দেহ করেনি। একদিনের জন্যেও জিজ্ঞাসা করেনি কেন তখন বাড়ি ফিরতে রাত হতো, কেনই বা এখন সন্ধ্যের ঠিক পরে পরেই বাড়ি ফিরে আসেন। তবে দেড় বছরে একটা কথাই বার বার তাঁর মনে খোঁচা দিত, কে খুন করল শর্মিলাকে? তার কোনো পুরনো নাগর? ঈর্ষার জ্বালায়? নাকি অন্য কোনো কারণে? পুলিসও কয়েকদিন চেষ্টা চালিয়েছিল।

তারপর কালের নিয়মে এক সময় সব থিতিয়ে গিয়েছিল।

বেশ ছিলেন রামানন্দ। কিন্তু হঠাৎ একী উৎপাত? কে এই সোহনলাল? দেড় বছর পর হঠাৎ ধূমকেতুর মত তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছে?

সত্যিই কী ও শর্মিলার স্বামী? শর্মিলা কিন্তু কোনোদিনও তার কোনো স্বামী-টামীর কথা বলেনি। ও বলেছিল, ছোটবেলায় ওর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তারপর সে মারা যায়। বিধবা মা অনেক কষ্টেস্বষ্টে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে সংসার অচল হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে জীবিকার সন্ধানে নামতে হয়। কিন্তু সুন্দরী মেয়ের পক্ষে জীবিকার সহজ পথ খোলা থাকে না। যা থাকে তাতে মায়ের ওষুধ-পথ্য জুগিয়ে সংসার চালানো শর্মিলার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে সহজে অনেক পয়সা রোজগারের এই পথটাই খোলা ছিল।

এইসব মেয়েদের কাহিনীগুলো মোটামুটি সব একই। রামানন্দও ও নিয়ে মাথা ঘামাননি। আসলে তাঁর শর্মিলাকে ভাল লেগেছিল। তিনি তাঁর অতীত নিয়ে কিছু চিন্তাও করেননি। একটি নারীর কাছে পুরুষ যা চায় সবই শর্মিলার কাছে তিনি পেয়েছিলেন। তাতেই তিনি সুখী ছিলেন। কিন্তু সোহন হঠাৎ কোত্থেকে যে হাজির হল?

সোহন চলে যাবার পর সারাদিন ঐ একই কথা ভেবেছেন। তিনি নিশ্চিত জানেন সোহনের কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা দিয়ে সে রামানন্দকে ফাঁসাতে পারে। কিন্তু লোকটা জানে যে সেদিন তিনি শর্মিলার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। এবং শর্মিলার সঙ্গে যে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ছিল এটাও সোহনের অজানা নয়। তাহলে সে কখনই তার মুখের ওপর অত বড় বড় কথা বলে যেতে পারত না।

কিন্তু সত্যিই যদি লোকটা ঝামেলা করে? যদি সে পুলিশে যায়? যদি সে সারা অফিসের লোককে জনে জনে বলে বেড়ায়? সব থেকে বড় ভয় শিবানীকে নিয়ে। শিবানীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যাই থাক, তিনি যে একজন নিষ্কলঙ্ক পুরুষ এটা সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। সে কেবল জানে তার স্বামীর একটু আধটু নেশা-টেশা করার অভ্যেস আছে। সে ব্যাপারে সে কিছু মনেও করে না। বাড়িতে নিজের ঘরে বসে মদ্যপান করাতেও তার বিন্দুবিসর্গ আপত্তি নেই। বরং নিজেই সে কয়েকবার দামী বিলিতি হুইস্কি বিভিন্ন অকেশানে প্রেজেণ্ট করেছে। রামানন্দ বেশ ভাল করেই জানেন, শিবানীর এক প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে তাঁর সম্বন্ধে। শিবানীর ধারণা রামানন্দ সৎ, পরিশ্রমী, বিশ্বাসী এবং চরিত্রবান।

কিন্তু সোহনলাল যদি সে রাত্রের ঘটনার উল্লেখ নিয়ে সরাসরি শিবানীর সঙ্গে দেখা করে, অথবা কোনরকম ভাবে শিবানীর কানে তোলে শর্মিলার সঙ্গে তাঁর অবৈধ মেলামেশার কথা, তাহলে তাঁর সব ইমেজ মুহূর্তে খান খান হয়ে যাবে। স্বরচিত স্বর্গ টি নিমেষে চুরমার হয়ে যাবে।

না, সে অসম্ভব। শিবানীর কাছে তাঁর উঁচু মাথা কিছুতেই নামিয়ে আনতে পারবেন না। দাম্পত্যজীবনে অতৃপ্তি হয়তো আছে, কিন্তু তার বদলে আছে একটি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন সুখের আবাস। শিবানী যদি এসব জানতে পারে তাহলে হয়তো একূল ওকূল দুকূলই বিসর্জন দিতে হবে।

অফিস থেকে একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন রামানন্দ। আজ আর তাঁর কোন কিছুই ভাল লাগছিল না। গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেলেন গঙ্গার ধারে। সোজা ফোর্টউইলিয়মের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে এসে থামলেন গোয়ালিয়র মনুমেণ্টের কাছে। গাড়ির মধ্যেই গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে রইলেন অনেক অনেকক্ষণ। মাথার মধ্যে আকাশ-পাতাল চিন্তা।

এক একবার তার মনে হচ্ছিল গুলি করে সোহনলালের খুলি উড়িয়ে দিতে। লোকটা খুব সেয়ানা আর শয়তান। এত সহজে সে নিষ্কৃতি দেবে বলে মনে হয় না। লোকটার স্পর্দ্ধা কী? রীতিমত ব্ল্যাকমেলিং। তাও এক আধ টাকা নয়। প্রতি মাসে দশ হাজার। যা তাঁর পক্ষে একান্তই অসম্ভব। প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা চেক কাটবেন কোন্ অ্যাকাউণ্টে? শিবানীর কাছে কৈফিয়ৎ দেবেন কী? একবার দশ হাজার নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত দশ হাজার নেওয়া সম্ভব নয়। শিবানী জানতে চাইবেই। চাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তর? চ্যারিটি? কোথায়? কাকে? এবং এ চ্যারিটি বেশীদিন চললে খুব ন্যায়সঙ্গত কারণে শিবানী খোঁজখবর নিতে থাকবে। আর শিবানী যে ধরনের চতুর মহিলা, ওর পক্ষে আসল ব্যাপারটুকু জেনে নেওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা তোলা মানে আখেরে ধরা পড়ে যাওয়া? তখনও একূল ওকূল দুকূলই যাবে। ঘর বার কোনো কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু এখন কী করা যায়? ভাবতে ভাবতে রাত গড়িয়ে চলল। সিগারেটের পর সিগারেট শেষ হয়ে গেল। এরই মধ্যে গাড়ির আশেপাশে দু'একটি স্ট্রীট গার্লের মুখ উঁকি দিয়ে, বিশেষ অঙ্গভঙ্গী জানিয়ে দূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল।

রামানন্দর ওসব দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটি কথা বিদ্যুৎ চমকের মত খেলা করে গেল। বোধহয় ফুলশয্যার রাতেই শিবানী তাঁকে

একটা কথা বলেছিল। আমার কাছে কোনো কিছু লুকিও না। গোপন করাটা আমি ঠিক পছন্দ করি না।

রামানন্দ ভাবলেন, আচ্ছা তাই যদি হয়? সোহন যেরকম নাছোড়বান্দা শয়তান টাকা না পেলে ও সবকিছু করতে পারে। দরকার পড়লে ও স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই ব্ল্যাকমেল শুরু করবে। আর শিবানীকে লুকিয়ে টাকা দেওয়া তার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয়। অথচ মর‍্যালিটির দিক থেকে সে এক পয়সাও সোহনকে দেবে না। কারণ রামানন্দ শর্মিলাকে খুন করেননি। বিনা কারণে তাঁকে চরম দুর্ভোগে পড়তে হবে।

বাঁচার শেষ অস্ত্রটি তিনি তুলে নিলেন। ভেবে দেখলেন এছাড়া কোনো মতেই তিনি অন্তত গৃহশান্তি বজায় রাখতে পারবেন না। শিবানীর কাছে সবকিছু স্বীকার করা। গত তিন বছরের শর্মিলা সংক্রান্ত সব কথা খুলে বলা। তাহলে হয়তো শিবানীর মার্জনা তিনি পেতে পারেন। ভুল তো মানুষই করে। তিনিও করে ফেলেছেন। শিবানী দেখতে জরদগব হলেও প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী। সহানুভূতিশীল। অপরাধী দোষ স্বীকার করলে ক্ষমা করার মত মানসিকতা তার আছে। অন্তত বাইরের শত্রুটিকে ঘায়েল করতে হলে ঘরের মিত্রের পদানত হওয়া অনেক সুখের। হয়তো শিবানীই কোনো উপায় বাতলে দেবে। আর পুলিশ? মনে হয় না লোকটার পুলিসে যাবার ক্ষমতা আছে। তাহলে দেড় বছরের মধ্যে সে পুলিসে যেতো। আর গেলেই বা কী? একজন উটকো লোক এসে বলে দিল অমনি তিনি খুনী হয়ে গেলেন? তার জন্যে প্রমাণ দরকার। তার জন্যে আদালত আছে। আইন আছে। আইনজীবী আছে। শিবানী যদি একবার ক্ষমা করে দেয় তাহলে সেই সেরকম বুঝলে বড় ব্যারিস্টার রাখবে। সোহনলালকে টিট করা তাঁর থেকেও অনেক সহজ শিবানীর পক্ষে।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল রামানন্দর। শেষ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। সোজা এসে পৌঁছলেন নিজের বাড়িতে।

রাত তখন প্রায় ন'টা। এ সময়ে অন্যদিন শিবানী নিজের বিছানায় বসে হয় হিসেব-টিসেব দেখে, নয়তো বইটই পড়ে। বই পড়াটা ওর বিশেষ নেশা। সেদিন কিন্তু শিবানী বিশাল হলঘরটায় তদারকির কাজ করছিল। চাকর রঘুনাথকে দিয়ে সোফাগুলো একটু এদিক ওদিক সরাচ্ছিল। টুকিটাকি গৃহকর্মগুলো ও সময় পেলেই রঘুনাথকে দিয়ে করিয়ে নেয়। রঘুনাথ অনেক দিনের পুরনো বিশ্বাসী চাকর।

ক্লান্ত, অবসন্ন, প্রায় ঝোড়ো কাকের মত রামানন্দ ফিরলেন। তাঁকে দেখলেই

বোঝা যায় প্রচণ্ড একটা মানসিক ঝড় তাঁর মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। শিবানী একবার চোখ তুলে তাকাল। ওর দৃষ্টিতে কোনো ভাষা থাকে না। কিন্তু সেটা বহিঃপ্রকাশ। আসলে ও একবার কোনো মানুষকে দেখলে তার ভেতরটা পর্যন্ত পড়ে নিতে পারে। খুব নিরাসক্ত ভঙ্গীতে শিবানী বলল, 'খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে?'

রামানন্দ কিছু না বলে ধীরে ধীরে সোফায় বসে পড়লেন। মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিলেন সামনের দিকে।

'রঘু, বাবুর জন্যে বেশ কড়া করে এক কাপ কফি ওপরের ঘরে নিয়ে এস।'

রঘু চলে গেল। শিবানী আরো কয়েক সেকেণ্ড রামানন্দর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ওপরে এস।'

'শিবানী…'

'কিছু বলবে মনে হচ্ছে। ওপরে এস।

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে শিবানী ওর বিশাল শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেল। রামানন্দ জানেন শিবানীর অনুরোধ মানেই আদেশ। ওর ধীর শান্ত কথাগুলোই শেষ কথা। তিনিও শিবানীকে অনুসরণ করে উঠে গেলেন ওপরে, মানে শয়নকক্ষে।

ততক্ষণে শিবানী রামানন্দর পাজামা আর পাঞ্জাবি বার করে এনেছে। রামানন্দ ঘরে ঢুকতেই সেগুলো ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যাও আগে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে এস।'

'কিন্তু?'

'সব শুনব। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ঘটনা যা ঘটবার অনেক আগেই ঘটে গেছে। পাঁচ মিনিট পরে শুনলেও অবস্থার রকমফের হবে না। যাও কফি এসে যাবে এক্ষুণি।'

অগত্যা পাজামা-টাজামা নিয়ে রামানন্দ অ্যাটাচড্ বাথে ঢুকে গেলেন। এখন শীতকাল। শিবানী একটা নতুন ধরনের সোয়েটার বুনছিলেন, রামানন্দর জন্য। মুখ-টুখ ধুয়ে রামানন্দ তার সামনে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন কীভাবে কথাটা শুরু করা যায়। উল বুনতে বুনতেই প্রসঙ্গ তুলল শিবানী নিজেই, 'খুব ভয়াবহ রকমের কিছু নাকি?'

রামানন্দ যেন কথার খেই পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, মানে, আমি বড় বিপদে পড়ে গেছি।'

'সংক্ষেপে বল।'

‘তোমাকে না জানিয়ে আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি।’

উল বোনা চলছিলই। বুনতে বুনতেই অত্যন্ত নিথর বরফ-ঘষা গলায় শিবানী বলল, ‘জানি তো।’

‘জানি—মানে?’

‘শর্মিলা প্যাটেলের কথা বলবে তো?’

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও রামানন্দ অত চমকাতেন না। তাঁর মুখের ভাব নিমেষে পাল্টে গেল। কেমন এক হতবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, ‘শর্মিলাকে তুমি চেনো?’

‘তিন বছর আগে তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল। একটা পার্টিতে।’

‘হ্যাঁ।’

‘তারপর বছর দেড়েক প্রায় প্রত্যেকটা সন্ধ্যেই তার ফ্ল্যাটে তুমি যেতে। আর প্রতি মাসে অনেকগুলো টাকা তার জন্যে খরচ করতে।’

রামানন্দর কোনো কথা বলার শক্তি ছিল না। বোবার মত কেবল ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতে পারলেন।

‘তা এখন অসুবিধা কী? সে তো বছর দেড়েক আগে খুন হয়েছে।’

সেই মুহূর্তে রামানন্দর নিজেকে পাঁঠা এবং নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই মনে হল না। এই মেয়েটির কাছে তাঁর নতুন করে বলার যে কিছুই নেই এটুকু ভেবে কেবল একটি স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

‘তাতে তোমার ঝোড়ো কাক হবার কী আছে?’

‘আজ একটা লোক এসেছিল। সোহনলাল নামে।’

‘অফিসে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কে সে? কী চায়?’

‘টাকা।’

‘কেন?’

‘আমি নাকি দেড় বছর আগে শর্মিলাকে খুন করেছি।’

‘তাতে তার কী?’

‘সে নাকি শর্মিলার স্বামী।’

‘অ।’

‘কিন্তু শিবানী, তুমি বিশ্বাস কর, শর্মিলার সঙ্গে আমি মিশেছিলুম ঠিকই, কিন্তু তাকে আমি খুন করিনি।’

'আমি জানি, মশা আর ছারপোকা ছাড়া অন্যকিছু তোমার পক্ষে মারা সম্ভব নয়। তা কত টাকা চাইছে, লোকটা?'

'অনেক। মাসে দশ হাজার।'

হাতের বোনাটা নিয়ে শিবানী উঠে এল রামানন্দর ঠিক পিছনে। তার এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধ পর্যন্ত মাপ দেখে নিতে নিতে বলল, 'লোকটার ঠিকানা কি?'

'ঠিকানা দেয়নি। দিয়েছে একটা ফোন নাম্বার। সময় দিয়েছে আটচল্লিশ ঘণ্টা। এরমধ্যে তাকে জানিয়ে দিতে হবে।'

'কী?'

'টাকা সে পাবে কী পাবে না।'

'তুমি কী বলেছ?'

'একটা ব্ল্যাকমেলারকে যা বলা উচিত। দূর দূর করে লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলেছি, একটা নয়াপয়সাও তাকে দেবো না।'

'অত্যন্ত বোকামী করেছ।'

'তার মানে?'

'ভবেশ ঘোষের একটা ইজ্জত আছে। তাছাড়া তুমি তাঁর জামাই। জামাই সম্বন্ধে স্ক্যাণ্ডাল ছড়ালে ঘোষ পরিবারের বদনাম হবে। আর তোমার বদনাম মানে আমারও বদনাম। লোকটাকে একটা ফোন করে দাও।'

'কী বলছ তুমি শিবানী?'

'ওকে বলে দাও চারদিন পর সকালে এ বাড়িতে চলে আসতে। ও যা চাইছে তাই-ই পাবে।'

'মাসে মাসে দশ হাজার টাকা করে গুণাগার দিতে হবে? অকারণে?'

'রামানন্দ বসুর ইজ্জতের থেকে মাসে দশ হাজার টাকার মূল্য নিশ্চয়ই বেশী নয়।'

শিবানী আর কিছু না বলে সোজা রান্নাঘরে চলে যাচ্ছিল। রামানন্দর জন্যে কিছু মুখরোচক খাবার সে এই সময়েই তৈরী করে নেয়। পাতে নানারকম পদ না থাকলে রামানন্দর আবার খাওয়ায় রুচি আসে না। দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে ও থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একটা লুকনো মাইক্রো-ফোন তোমার চেম্বারে আছে না?'

'হ্যাঁ।'

'আজকের ক্যাসেটটা নিশ্চয়ই বার করে নিয়েছ?'

'ক্যাসেট মানে—কই নাতো!'

'এটাও বোকামী নেওয়া উচিত ছিল। তোমার আর সোহনের কথাবার্তা যদি টেক হয়ে গিয়ে থাকে।'

'কিন্তু আমি তো শ্যামদুলালকে কোনো ইনস্ট্রাকশান দিইনি।'

'ভুলে যেও না, তাকে স্ট্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, কোনো অপরিচিত লোক এলে, এবং প্রয়োজন মনে করলে সে তার কথাবার্তা টেক করতে পারে। অ্যাণ্ড, সোহন ওয়াজ অ্যান আননোন অ্যাণ্ড মিসচিভাস পার্সন। যাইহোক কাল সকালে গিয়ে প্রথমেই টেপটার খোঁজ করবে।'

শিবানী আর দাঁড়ালো না। বিবশ, অবসন্ন রামানন্দ কেবল ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি ঠিক বলছেন শ্যামদুলালবাবু?'

'হ্যাঁ, নীলাঞ্জনবাবু, ক্যাসেটটা ঠিক জায়গায় রেখে দেবার জন্যে আজ আমি বিফোর অফিস আওয়ার্স, পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি যাবার একটু পরেই রামানন্দ বসু চলে এলেন। আর এসেই প্রথমে ক্যাসেটটা চেয়ে নিলেন। ক্যাসেটটা ফিরে পাবার পরই ওর মুখে একটা তৃপ্তির ভাব দেখেছিলুম।'

'টেপের ব্যাপারে উনি কোনো প্রশ্নট্রশ্ন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। এসেই আমাকে চেম্বারে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কালকের ঐ লোকটির সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় সেটি নোট করেছি কিনা। আমি হ্যাঁ বলতেই উনি ক্যাসেটটা দিয়ে যেতে বললেন।'

'আর কিছু?'

আমি ফিরতে ফিরতেই দেখলুম, টেবিলে রাখা ডেটক্যালেণ্ডার থেকে একটা নম্বর দেখে উনি ডায়াল করতে আরম্ভ করলেন। আমি ইচ্ছে করেই একটু দেরী করে ঘর থেকে বের হই। আমার অনুমান ঠিকই ছিল। উনি লাইনটা পাবার পরই সোহনলালের নাম বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, এই নিন।'

'ফোনের কোনো কথাবর্তা শুনেছিলেন?'

'না। কথা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উনি আমার দিকে তাকান। বাধ্য হয়ে

আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়। পরে একসময় গিয়ে নাম্বারটা নোট করে নিয়েছিলুম।'

নাম্বার লেখা কাগজটা নিতে নিতে নীল বলল, অনেক ধন্যবাদ শ্যামদুলালবাবু, পুলিস এর জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আপাতত আর আপনাকে বিরক্ত করব না। তবে একটা কথা, দেবার মতো কোনো খবর থাকলে জানাতে ভুলবেন না। আরো একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনি যে আমার কাছে এসেছেন সেটা যেন কোনোমতেই আপনার ব্যবহারে প্রকাশ না পায়। আপাতত আর আপনার কিছু করার নেই। বল এখন আমাদের কোর্টে। দেখা যাক। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপটাকে কোথায় পাওয়া যায়।'

শ্যামদুলালকে আজ সামান্য বিষণ্ণ লাগছিল। দেড় বছর আগের হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া এক রহস্য ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। এর ওপর ছিল ঈর্ষার ঘুনপোকা। রামানন্দকে ফাঁসাবার এমন চমৎকার সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চায়নি—। উৎসাহের আতিশয্যে ছুটে এসেছে নীলের কাছে—। তবু কোথায় যেন একটা বিবেক দংশন—। একটা অপরাধবোধ ওর মধ্যে সমানে কাজ করে চলছিল। সেটাই প্রকাশ পেল, 'ঘর শত্রু বিভীষণের মত কাজ হয়ে গেল, তাই না মিঃ ব্যানার্জি ?'

'অন্যভাবেও চিন্তা করতে পারেন। আমি জানি না রামানন্দবাবু সত্যিই দোষী না নির্দোষ। কিন্তু আপনি যা করেছেন সেটা অন্যায় নয়। বরং এ ব্যাপারটা চেপে থাকলে বিবেকের দংশনটা আসত অন্যভাবে। সেটা হতো আরো মারাত্মক আর দীর্ঘস্থায়ী। আজ আপনার মধ্যে একটা সেন্টিমেন্ট প্লে করছে। ভাবছেন নিজের বসের সঙ্গে শত্রুতা করছেন। কিন্তু সত্যিই যদি রামানন্দবাবু খুন করে থাকেন, তাহলে নিজেকে কী উত্তর দিতেন ?'

'সবই বুঝি নীলাঞ্জনবাবু···কিন্তু সেই তবুটা ছাড়ছে না। যাইহোক আজ আমি চলি।'

শ্যামদুলাল চলে যাবার পর নীল নাম্বারটা দু'একবার মনে মনে আওড়ালো। তারপর ফোন তুলে বিকাশবাবুকে ডায়াল করল। কলকাতার লাইন বোধহয় সম্প্রতি ঠিক মত কাজ করছে। একবার ডায়াল করেই বিকাশবাবুকে পাওয়া গেল। নীল কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলল, শ্যামদুলাল আজও এসেছিল।

ওপাশ থেকে বিকাশের ব্যগ্র কণ্ঠস্বর, 'তাই নাকি ? এনি ইমপর্ট্যাণ্ট নিউজ ?'

'একটা ফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে নাম্বারটা সোহনলালের। একটু যোগাযোগ করুন। লোকটা সাংঘাতিক এবং নাম্বার ওয়ান ব্ল্যাকমেলার।

অন্য কিছু ঘটনা ঘটার আগেই কিন্তু লোকটাকে পাকড়াও করতে হবে।'

'ঠিক আছে ব্যানার্জীসাহেব, ওটা আমার হাতেই ছেড়ে দিন। নাম্বারটা বলুন।'

নাম্বার লিখতে লিখতে বিকাশ বলল, 'আমি একটা কথা বলব?'

'কেন বলবেন না।'

'শ্যামদুলালবাবু ভদ্রলোকটি কেমন?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নটা আসছে। মানে, উপযাচক হয়ে এতসব করছে। উদ্দেশ্যটা কী?'

নীল হেসে বলল, 'এই মশাই আপনাদের এক দোষ। কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে আপনাকে সাহায্য করছে—অমনি তার ফ্যাকড়া শুরু করে দিলেন? কেন সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

'হবে না? আপনার হচ্ছে না?'

প্রায় সেকেণ্ড খানেকের মত নীরব থেকে নীল বলল, 'তা হচ্ছে। ভেবেওছি। একটা কমপ্লেক্স ওর মধ্যে কাজ করছে। ওকে টপকে রামানন্দবাবু আজ ওর বস্। ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। শ্যামদুলালবাবুও আমার মাথায় আছে।' ক্যাসেটটা ঠিক মত আছে তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ও একেবারে সেফ্ ভল্টে।'

'ঠিক আছে, আমি এখন রাখছি, তবে সোহনকে পেলে আমাকে খবর দেবেন। লোকটার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। খুব তাড়াতাড়ি ওকে পাকড়াও করতে হবে, নইলে—'

'নইলে? সে এখন থাক। পরে বলব। আপাতত ওকে খুঁজুন।'

ফোন রেখে নীল ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করল।

দু তিনবার ডায়াল করতেই নাম্বারটা পাওয়া গেল। সোহনের নাম করতেই ওপাশ থেকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে এক পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। 'নেহি জি আভি তো সোহনলাল ইধার নেহি হ্যায়। লেকিন ...'

গলাটা বেশ ভারি করে বিকাশ তালুকদার বললেন, 'লেকিন...'

'উসকা আনেকা কোই ঠিক নেহি, যব উস্‌কা দিল চাতা ইধার আ যাতা।'

'আজ উসকা আনেকা কোই চান্স হ্যায় ?'

'হো ভি সকৃতা।'

'ঠিক হায়, এলে বলবেন, সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় আমি যাব। আমার নাম রামানন্দবাবু। থাকতে বলবেন। ও হ্যাঁ, জায়গাটা ঠিক কোথায় হবে ?'

'শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। কোই দোকানদারকে রামশরণকা কাঠগোলা বললেই পাত্তা লাগিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে', বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে বিকাশ তালুকদার সামনে বসা নীলের দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন, 'ব্যাটা আজ এলে নিশ্চয় থাকবে—কি বলেন ?'

'হ্যাঁ, কারণ ও আজ আসবেই, যেখানেই থাকুক না কেন। মিঃ বাসুকে আটচল্লিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে গেছে। উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে রামানন্দবাবু ওর ফোন পাবার আশায়। আর যখনি শুনবে রামানন্দবাবু ফোন করেছিলেন। চিন্তার কিছু নেই, একেবারে পাকড়াও করে আনান।

বিকাশবাবু বেল টিপে এস আই রমেন রায়কে ডেকে যা যা করতে হবে বলে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর রমেন রায় কেতাদুরস্ত বাঙালী বাবুটি সেজে হাজির হলেন রামশরণের কাঠ গোলায়। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সন্ধ্যের মুখে মুখেই সোহনলাল এসে হাজির। জমিয়ে বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু রামশরণের মুখে রামানন্দর নাম শুনেই সে ত্বরিত লাফে রমেন রায়ের সামনে এসে থতমত খেয়ে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই রমেনবাবু বললেন 'তুমিই সোহনলাল ?'

'জী। লেকিন আপ ?'

'আমি রামানন্দবাবুর কাছ থেকে আসছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাতাইয়ে। কুছ সমাচার।'

'উনি এখুনী তোমায় ডাকছেন।'

'আভভি ?'

'হা, আভভি।'

অনেক আশা নিয়ে বাইরে এসে হঠাৎ পুলিশ জীপ দেখে হকচকিয়ে গেল। ব্যাপারটা যে ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝার আগেই রমেনবাবু বললেন, 'নাও ওঠো।'

'লেকিন...পুলিশ কা জীপ কিঁউ ?'

'তোমার মত একটা ছুঁচোকে নিয়ে যেতে জীপই যথেষ্ট। চল, ওঠো।'

কী যে ঘটছে আর কী যে ঘটবে কোন কিছু বোঝার আগেই রমেন রায় সোহনের জীর্ণ হাতটি পাকড়াও করে ফেলেছেন। সোহনের কিছু করারও ছিল না। বরাবরই ও পুলিশকে এড়িয়ে চলে, কিন্তু এখন একেবারে বাঘের মুখে। তার ঐ অশক্ত শরীর নিয়ে পালাবার কথা ভাবতেও পারল না। বাধ্য হয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'পুলিশ কিঁউ, কসুর কেয়া হ্যায় মেরা?'

'সেটা গেলেই বুঝতে পারবে। ড্রাইভার···।'

বিকাশ তালুকদারের মানসিক দুর্বলতা যাই থাকুক না কেন, বাইরে জাঁদরেল অফিসার। চেহারাও দোপাট্টা। গলার স্বরও বেশ বাজখাই। সোহনকে দেখেই গাঁকগাঁক করে উঠলেন। তিনি জানেন এইসব চরিত্রহীন ছিঁচকেগুলোর সঙ্গী কেমন ব্যবহার করতে হয়—।

'তোমারই নাম সোহনলাল?'

'জী।'

'হুঁ। বোলা।'

সোহনলাল তখন বেশ জড়োসড়ো। মুখের চেহারাও পাল্টে গেছে। কোন-মতে ঢোঁক গিলে বলতে পারল, 'সাব, ম্যায়নে তো কুছ অপরাধ নেহি কিয়া।'

'তোমায় বসতে বলেছি···কি অপরাধ করেছ তা এখনও জানতে চাইনি।'

'জী', বলে সোহন গুটিগুটি গিয়ে চেয়ারে বসল। আসলে সোহনের মত মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষগুলোর চারিত্রিক দৃঢ়তা বলে কিছু থাকে না। সোহনলালের তো নেই-ই।

বিকাশ তালুকদার ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'থাকো কোথায়?'

'কোই ঠিক নেহি।'

'মানে?'

'মেরা কোই আস্তানা নেহি হ্যায়। যব, যিধার সুবিস্তা হোতা···।'

'হুঁ। নেশা করার টাকা কে দেয়?'

'জী?'

'বলছি, চেহারা দেখে তো মনে হয় না রোজগারপাতি কিছু আছে—তা মদের টাকা আসে কোত্থেকে?'

'নেহি জি। হাম দারু নেহি পিতা।'

'এক থাপ্পড়ে তোমার বদন পেছন দিকে ঘুরিয়ে দোব। মাল খেয়ে খেয়ে টেঁসে যাবার সময় হয়ে গেল এখনও মিথ্যে কথা। কে দেয় টাকা?'

'কোই নেহি 'সাব। মেরা যেইসা আদমিকো কোন্ দেগা দারু পিনেকা রূপয়া?'

'শর্মিলা প্যাটেল তোমার কে হয়?'

ঠিক এই ভয়টাই করছিল সে। সে জানত পুলিশ তাকে ধরলেই তার বিবির কথা জিজ্ঞাসা করবে। আর বিবির কথা বলতে গেলেই তার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। দেড় বছর ধরে পালিয়ে থেকেও নিষ্কৃতি নেই। শর্মিলাকে সে খারাপ পথে নামিয়েছিল ঠিকই, তার পয়সায় স্ফূর্তি করেছে ঠিকই, কিন্তু তার খুন হওয়ার ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। কিন্তু স্বামী হিসেবে তার মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। বিশেষ সে তার খুন হবার কথা জেনেও পুলিশে কোন রিপোর্ট করেনি। এও এক ধরনের অপরাধ। যদিও সে শর্মিলাকে খুন করেনি।

'কি হল, কথা বলছ না কেন? শর্মিলা তোমার কে হয়?'

'জি, মেরা জরু।'

'সে এখন থাকে কোথায়?'

'নেহি জানতা সাব।'

'থানায় বসে মিথ্যে কথা বললে পিঠের চামড়া গুটিয়ে দোব, আজ থেকে দেড়বছর আগে এক বর্ষার রাতে সে খুন হয়, তুমি জানো না?'

সোহনলালের উত্তর দেবার কিছু ছিল না। সে চুপ করে বসে থাকে। 'তুমি জানতে না?'

হঠাৎ সোহনলাল হাঁউ মাঁউ করে কঁকিয়ে ওঠে, 'লেকিন সাব, আপ বিশওয়াস কিজিয়ে, ম্যায় নে উসকো খুন নেহি কিয়া?'

'আমি জিজ্ঞেস করছি সে খুন হয়েছিল এটা তুমি জানতে কিনা?'

ঘাড় নেড়ে মোহন বলে, 'জি।'

'থানায় কিছু রিপোর্ট না করে এদ্দিন গা ঢাকা দিয়েছিলে কেন?'

'জি, উও তো রেণ্ডি বন গিয়া থা, ইসি লিয়ে উসকি সাথ মেরা কোই রিস্তা নেহি থা ··তো···'

'সোহনলাল, ঠ্যাঙানি যদি খেতে না চাও তাহলে যা জিজ্ঞাসা করছি সব সত্যি কথা বল, নইলে—'

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বিকাশ তালুকদার বললেন, 'তাকে খারাপ

পথে নামিয়েছিলে তো তুমি, আর সেই পয়সায় মদ খেতে তাইতো ?'

আর মিথ্যে কথা বলার কোন রাস্তা নেই দেখে সোহন বলল, 'জি, হাঁ।'

'তুমি জানতে সে কবে খুন হয়েছিল ?'

'জি হাঁ।'

'পুলিশে জানাওনি কেন ?'

'পুলিশকে আমার বহুত ডর লাগে।'

এতক্ষণ নীল পাশে বসে সব শুনছিল। হঠাৎই সে ইশারায় বিকাশ তালুকদারকে চুপ করতে বলে জিজ্ঞাসা করল, 'শর্মিলা প্যাটেলকে তুমি যে খুন করনি এটা আমরা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তোমায় কেন ডাকা হয়েছে তা বুঝতে পারছ কি ?'

নীলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সোহন বলল, 'নেহি সাব।'

'আমরা জানতে পেরেছি, তোমার স্ত্রীকে কে খুন করেছিল তা তুমি জান।'

মাথা হেঁট করে সোহন বলল, 'হাঁ সাব। মালুম হোতা কি ম্যায়নে উনহিকো পয়ছান লিয়া।'

'কে, কে লোকটা।'

'বহুত বড়া আদমি। রামানন্দ বসু। ঘোষ কেমিক্যাল্‌স্ কা মালিক হ্যায়।'

'কোন প্রমাণ আছে তোমার কাছে ?'

'জি ?'

'বলছি, একজন ভদ্রলোকের ওপর খুনের অভিযোগ করছ, তার কোন প্রমাণ তোমার কাছে আছে ?'

'নেহি সাব, লেকিন।'

'লেকিনটা কী ?'

'যো রাত মেরা বিবি খুন হুয়া থা, ম্যায়নে উহো সবকো উস কোঠিমে ভাগ্‌নে দেখা।'

'ব্যস, তখনই প্রমাণ হয়ে গেল যে বাসু সাব তোমার বৌকে খুন করেছিল ? আর সেই ভয় দেখিয়ে তুমি বাসুসাহেবকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ ?'

'কেয়া করে বাবু, মেরা বিবি মর গিয়া আউর মেরা ধান্দা ভি খতম হো গয়ি আব মুঝে জিনে তো পড়েগা।'

'বা চমৎকার যুক্তি।'

'লেকিন সাব, আগর উয়ো সব ঝুটা নেহি হ্যায় তো ডরা কিস্ লিয়ে···যব ম্যায়নে উস্‌কো রূপয়া লিয়ে বোলা, বিবিজিকো নাম কিয়া, ম্যায়নে দেখা কি

সাহাবকো হুলিয়াকা রঙ বদলগিয়া জরুর কুছ গড়বড় হ্যায়।

'হুঁ' বলে নীল চুপ করে কি যেন ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল, 'আর কোন লোককে তুমি সেই সন্ধ্যায় দেখতে পাওনি, তোমার বিবির ঘরে বা আশেপাশে?' 'নেহি সাব' বলেই সহসা ও থেমে গেল, তারপরই হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে, এমনভাবে বলল, 'হাঁ সাব, ম্যায়নে তো একদম ভুল গিয়া, উসিবক্ত ম্যায়নে আওর এক বাবুকো হড়বড়াকে ভাগ্‌নে দেখা। ও শালে মুঝে জোর ধাক্কাসে মাটিমে গির ফেকাথা—আউর ভাগ্‌ ভি গিয়া থা।'

'কে সেই লোকটা।'

'মুঝে নেহি মালুম, কিঁউ কি ইতনা জোর বারিষ হো রাহা থা, ম্যায়নে উনকো হুশিয়াভি দেখ নেহি সেকা।

'তার মানে সেই সন্ধ্যায় দুজন লোক গিয়েছিল শর্মিলার ঘরে, আগু পিছু দুজনেই হুড়মুড় করে পালিয়ে গিয়েছিল…'

'হাঁ সাব।'

'তাহলে কি করে তুমি বাসু সাহেবকে দোষী বলছ? পরে যে লোকটা তোমায় ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছিল। সেও তো খুন করতে পারে?'

'হো ভি সক্‌তা, লেকিন, যে আদমী পহেলে ভাগা থা, সক্ত তো উনহি পর পহেলাই হোনা চাহিয়ে কিউঁ কি খুনী আদমী ভাগতা হ্যায় পহেলে, পিছু নেই।'

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল প্রায় আপনমনেই বলল, 'না হে মোহনলাল, এত সহজে বলা যায় না যে বাসুসাহেবই তোমার বিবিকে খুন করেছে।'

'তব?'

'বাসুসাহেবকে তুমি ক'দিন যেন সময় দিয়েছিলে?'

'জী দো রোজকা।'

'তার মানে এখনও বারো ঘন্টার মত সময় আছে? তোমায় আমরা এখন একট শর্তে ছেড়ে দিতে পারি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মোহন নীলের দিকে তাকায়।

'যদি বাসুসাহেব তোমায় ফোন করে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমায় এসে রিপোর্ট করবে। 'তিনি যা যা বলবেন সব তোমায় বলতে হবে।'

'তাড়াতাড়ি পালাবার জন্যে 'জরুর' নয়, পুলিশ যখন একবার তোমার হদিশ পেয়েছে, তখন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে থাকার চেষ্টা করেও পালিয়ে থাকতে পারবে না, আর ধরা পড়লে, তখন সমস্ত খুনের দায়টা তোমার ওপরেই পড়বে

এটা মনে রেখো।'

'জরুর সাব। খুনকা ইনজাম ম্যায় নেহি লেনে চাতা লেকিন মেরা ইনকাম খতম হো জায়গা। ঠিক হ্যায় সাব, আপ যো কহতা হ্যায়, সোহি হোগা। আব ম্যায় যা সকতা ?

নীল এবার বিকাশ তালুকদারের দিকে তাকালো।

বিকাশ বললেন, 'ঠিক আছে এখন যেতে পার, তবে....'

'চিন্তা মাৎ কিজিয়ে সাব, হাম জরুর আ জায়গা। নমস্তে সাব।'

পুলিশি জেরার হাত থেকে ও তখন পালাতে পারলে বেঁচে যায়। মোহন চলে যেতেই বিকাশ নীলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি মনে হচ্ছে ব্যানার্জি সাহেব ?'

'তেমন কিছু নয়, ভাবছি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে ?'

'আমার একজনের কথা মনে হচ্ছে ?'

'যেমন ?'*

'অনুমান আর কি, আপনার অতি উৎসাহী শ্যামদুলাল দত্ত।

'কেন যে শ্যামদুলালের পিছনে লেগেছেন বুঝতে পারছি না। ভুলে যাবেন না, শর্মিলা প্যাটেল খুন হয়েছিল রিভলবারের গুলিতে।'

'তো কী ? শ্যামদুলাল কী একটা রিভলবার জোগাড় করতে পারে না ?'

'কে জানে ? কার কোথায় কী এলেম আছে কে বলতে পারে ?'

'লোকটা বেছে বেছে একটা বর্ষার দিনে অফিসে চাকরি করতে যাবে রিভলবার নিয়ে ?'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না ?'

'তাছাড়া তার মোটিভটা কি ?'

'প্রফেশনাল জেলাসি। রামানন্দর জন্যে তার হয়ত কেরিয়ার নষ্ট হয়ে গেছে।'

'ধরে নিলুম এটাই তার মোটিভ। কিন্তু রামানন্দকে খুনের আসামী করতে পারলেই কি তার আখের ফিরত ?'

'হয়ত ফিরত ? কিম্বা অন্য কোন কারণও হতে পারে। মোট কথা শ্যামদুলালের ওপর নজর রাখা উচিত।

'রাখতে পারেন। তবে কেসটা খুব একটা সহজ নয়। শর্মিলা প্যাটেল হত্যার কারণ বেশ রহস্যময়। আজ উঠি। আপনি আপনার কাজ করুন। মোহন ফিরে এলেই আমায় খবর দেবেন।

নীল আর দাঁড়ালো না।

সোহনলালের সময়জ্ঞান আছে। তাকে ফোনে বলা হয়েছিল সে যেন ঠিক আটটার সময় আসে। এক মিনিটও সময়ের এদিক-ওদিক হয়নি। ঘোষ বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সে যখন বেল টিপল ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা। বিশাল হল ঘরে তখন রামানন্দ একা বসে ছিলেন। হাতে সেদিনের খবরের কাগজ। তাঁর সকালের চা জলখাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। খবরের কাগজে তাঁর তেমন মনটন ছিল না। খবরের কাগজ খোলা রেখেই তিনি আনমনে সিগারেট টানছিলেন। আসলে গত চারদিন ধরে তাঁর মনের মধ্যে একটা সংকোচ কাঁটার মত বিঁধেছিল। প্রায় বিনা কারণে বিশাল অঙ্কের টাকা প্রতিমাসে খেসারত দিতে হবে এটাও তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। একজন প্রতারককে প্রশ্রয় দিতে হচ্ছে। উচিত, ওকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু শিবানী কোন ঝামেলা চায় না। শিবানীর ডিসিশানের ওপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

ডোর-বেলের আওয়াজ হতেই রামানন্দ গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। যেন অন্য কারো জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এমন ভাব দেখিয়ে বললেন, 'ও তুমি। খুব পাংচুয়াল তো! এস, ভেতরে এস।'

রামানন্দর পিছন পিছন সোহনলাল এসে ঘরে ঢুকল। চারদিক চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখতে লাগল। রামানন্দ ততক্ষণে নিজের সোফায় গিয়ে বসে পড়েছেন। ওকে ওইভাবে দেখতে দেখে বললেন, 'অত দেখার কিছু নেই। এখানে এসে বোস।'

সোহনলাল হাত কচলাতে কচলাতে তাঁর সামনের সোফায় বসতে বসতে বলল, 'আহ্, কিত্‌না দিন যে এমোন ভালো বাড়িতে ঢুকিনি। সে ছিল যোখন রমা জিন্দা ছিল। তারপর···।'

একটা দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গিতে সোহনলাল সোফায় হেলান দিল। অত সকালেও সোহনের গা থেকে দিশী মদের গন্ধ ছাড়ছিল। রামানন্দ নিজে মদ্যপান করলেও দিশী মদের গন্ধটা সহ্য করতে পারতেন না। অন্য সময় হলে উঠে চলে যেতেন। কিন্তু এখন ঐ লোকটাকে সহ্য করতেই হবে।

'আপনি সার বলেছেন বাবুজি, রহিস আদমীর বাড়ি বেশি নজর দিতে নেই। তাতে নাকি টাকা কমে যাবে। হামিও বেশিক্ষণ থাকতে চাই না। কাজের কথায় আসেন বাবুজি। তো আপনি কী ঠিক করলেন বলুন!'

'বোসো, আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'মিসেস বোস?'

'কেন তোমার আপত্তি আছে নাকি?'

'নেহি বাবুজি। ভাবছিলুম অন্য কথা। কুছ চমক ভি লাগছে।'

'কেন ?'

'আপনি আমার কথা সোব জানিয়েছেন, ভাবিজিকে ?'

'তোমার কী মনে হয়, জানাবো না ?'

'রমা কথা ?'

'হ্যাঁ।'

সোহনের বোধহয় রামানন্দর কথা বিশ্বাস হল না। সে একটু অবাক নেশারু চোখে রামানন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাব্ ?'

রামানন্দ কিছু না বলে টেবিলের পাশে আটকানো একটা নবে চাপ দিলেন। তারপর বললেন, 'এক্ষুনি আসছেন। এলেই জেনে নিও।'

সোহনের চোখের ভাষা ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছিল। ভ্রূ দুটিও ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে হতে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। তারপর পরিপূর্ণ সন্দেহের দৃষ্টিতে রামানন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কী দিল্লাগী করার জন্যে আমাকে ডাকলেন ?'

'দিল্লাগী নয় মিঃ সোহনলাল।'

রামানন্দ আর সোহন দুজনেই চমকে উঠেছিল। কখন যেন শিবানী এসে ঘরে ঢুকেছে। দুজনের কারোরই তা নজরে আসেনি। শিবানীর হাতে একটা ট্রে। কিছু খাবার আর ধূমায়িত চায়ের কাপ। সোফার সামনে ছোট সেণ্টার টেবিলের ওপর খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে শিবানী বলল, 'আপনি আমাদের সমগোত্রীয় নন যে ঠাট্টা তামাসা করার জন্যে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে আপনাকে ডেকে পাঠাব। নিন চা জলখাবার খেয়ে নিন।'

'লেকিন ?'

'এতে কিন্তুর কিছু নেই। প্রথম এলেন এ বাড়িতে। একটু চা খাবার খেতেই হয়। আর খেতে খেতে আপনার কথা শোনা যাবে।'

সেদিন অফিসে যে দাপট নিয়ে সোহনলাল রামানন্দর সঙ্গে কথা বলেছিল, আজ শিবানী আসার সঙ্গে সঙ্গে ওকে কেমন যেন জড়সড় হতে দেখলেন রামানন্দ। মনে মনে যেমন একটু আনন্দও পেলেন, ঠিক তেমনি জোঁকের মুখে কেঁচোর উপমাটাও তাঁর মনে এল। ভাবলেন, বাছাধনকে এবার ট্যাঁ-ফোঁ করতে হবে না।

সত্যিই সোহন বেশ কুঁকড়ে গিয়েছিল। মহিলার বিশাল চেহারা আর বরফের মত ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে সে বেশ অস্বস্তি অনুভব করছিল। সকাল থেকে পেটে কিছু

পড়েনি। সামনে সুখাদ্যের সার। টোস্ট, ওমলেট, তিন চার রকমের মিষ্টি। দামী চায়ের মধুর সুবাস। কিন্তু তার হাত সরছিল না। বিশেষ ঐ মহিলার সামনে।

'নিন, খেতে আরম্ভ করুন। কাজের কথা সেরে ফেলুন। আমাদের এখন অনেক কাজ পড়ে আছে।'

আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে সোহনলাল একটা টোস্ট তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল। প্রায় ফোকলা দাঁতে কড়া টোস্টটা এপাশ ওপাশ করতে করতে হারানো নার্ভটা বোধহয় ফিরে পেল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'দেখুন ভাবিজি···'

'না,' আবার সেই বরফ ঠাণ্ডা স্বর, 'ভাবিজি নয়, মিসেস বোস।'

কাঁধটা শ্রাগ করার ভঙ্গীতে সোহন বলল, 'যো আপকা মর্জি। দেখিয়ে মিসেস বোস, আপনি তো সোবই শুনিয়েছেন, তো শর্মিলা খুন হয়ে গেল। হামার ভি বহুৎ ক্ষতি হয়ে গেল। এখোন হামাকে দেখে আপনি নিশ্চয় মালুম পাচ্ছেন হামার পজিশান কোতো খারাপ আছে, তো।'

'মান্থলি দশহাজার না হলে আপনার চলবে না?'

'জি।'

'আমি কী করে বুঝব টাকা পাবার পরও আপনি মুখ বন্ধ রাখছেন?'

সোহনলাল হাসল তার বিশ্রী ফাঁক ফাঁক দাঁত নিয়ে। তারপর বলল, 'ম্যাডাম, সোহনলাল খারাপ আদমী হতে পারে, নিজের জরুকে পয়সার জন্যে অন্য বাবুদের হাতে তুলে দিতে পারে, লেকিন সে বেইমান নয়। সোহনলালের বাত একটাই - রুপয়া। সেটা ঠিকমত পেলে দুনিয়ার আর কোনো বেপারেই সে মাথা গলাবে না। আউর একঠো বড়িয়া বাত কী জানেন, বাবুজির কথা ফাঁস করে দিলে যে হামার রুপয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এতো বড়ো বুর্বাক হামি নই।'

'আপনি খেয়ে নিন। আমি আসছি।'

'হামি কিন্তু চেক নিতে পারব না।'

'বেশ।'

শিবানী উঠে ওপরে চলে গেল। শিবানী থাকতে সোহনের খাওয়াটা ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছিল না। এবার সে গভীর মনোযোগে আহারে মন দিল। গত রাত্রে তার বরাতে কোনো খাবারই জোটেনি, কেবল মদ ছাড়া। রামানন্দ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলেন, নাঃ লোকটার খিদে বিশ্বগ্রাসী। ওকে ঐভাবে খেতে দেখে রামানন্দর মনে কিছুটা করুণার ভাব এল। সত্যিই যদি এ লোকটা শর্মিলার স্বামী হয়, এবং তার রোজগারই ওর একমাত্র উপায় হয়ে থাকে

তাহলে নিশ্চয়ই এখন ও বিপদগ্রস্ত। আর বিপদগ্রস্ত লোক অন্তত নিজের পেটটা ভরাবার জন্যেও অনেক নিচে নামতে পারে। কিন্তু তাই বলে প্রতিমাসে দশহাজার। এ যে রীতিমত জানিয়ে ডাকাতি। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জালিয়াতি।

সোহনলালের মেজাজ কিন্তু খুশ। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সেও ভাবছিল, ভাগ্যিস সেদিন এই লোকটা তার নজরে এসেছিল, নইলে কি এমন নরম সোফায় বসে দামী চায়ে চুমুক দিতে পারত? তার ওপর একটু পরেই আসছে কড়কড়ে দশহাজার টাকা। শুধু একবার নয়। মাস মাস। ঠিক একই দিনে। আহ্, রমা বেঁচে থাকতেও সে জীবনে একসঙ্গে এত টাকা চোখে দেখেনি। নসীব! নসীব। একেই বলে নসীব। তকদির যখন খোলে এমনি করেই খোলে। এখন থেকে রাজার হালে থাকবে। আজই গিয়ে সে এই ময়লা কুর্তা কোট আর ছেঁড়া প্যাণ্ট ছেড়ে ফেলবে। কিনতে হবে একজোড়া ভালো জুতো। দেড় বছরের নাকানি-চোবানি খাওয়া জীবনটার ভোল এবার সে পাল্টে দেবে। সুখের স্বপ্নে যখন সে তলিয়ে গেছে ঠিক তখনই পিছন থেকে শিবানীর গলা পাওয়া গেল, 'মিঃ সোহনলাল, এই নিন আপনার এ মাসের টাকাটা।'

বলেই শিবানী কড়কড়ে এক বাণ্ডিল এক'শ টাকার নোট সেণ্টার টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল।

'নিন গুনে নিন।'

'জরুরৎ কেয়া। আপনি তো গুনেই দিয়েছেন ম্যাডাম।'

'টাকা নেওয়া দেওয়াটা গুনেই করতে হয়। নিন গুনুন।'

'বাত তো সহি হ্যায়,' বলে সোহন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল নোটের বাণ্ডিলের ওপর। ছোঁ দিয়ে তুলে নিল। তারপর জিভে আঙুল ছুঁইয়ে গভীর মমতায় একটা একটা করে গুনতে শুরু করল।

সামনের টেবিলে বসে বসে রামানন্দ ওর নোট গোনা দেখছিলেন। রাগে তাঁর তখন সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিলেন কতক্ষণে এ আপদ এখান থেকে বিদেয় হবে। লোকটার উপস্থিতিই তাঁর পক্ষে বিরক্তিকর।

সোহনলালের নোট গোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ঠিক তখনি এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য প্রস্তুত ছিল না সোহনলাল। প্রস্তুত ছিলেন না রামানন্দ। দুজনেই এক লহমার জন্যে একটি শব্দ শুনেছিলেন। ফট্। সেই ফট্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ দেখলেন সোহনের মাথাটা হুমড়ি খেয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপরই রামানন্দ দেখলেন মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে

সেন্টার টেবিলের কাচ ভেসে যাচ্ছে।

ভয়ে, বিস্ময়ে এবং বিহ্বলতায় রামানন্দ সামনের দিকে চোখ তুলে যা দেখলেন তাতে তাঁর অস্ফুট আর্তনাদ করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

শিবানীর হাতে তখনও ধরা আছে একটি রিভলভার। অন্য হাতে সোফার ব্যাকপিলো। তখনও কিঞ্চিৎ ধোঁয়ার রেশ। শিবানীর চোখের দিকে তাকালেন রামানন্দ। না, কোনো ভাষা নেই। মৃত মাছের চোখের মত নিশ্চল আর নিষ্প্রাণ।

ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে রামাবন্দ বললেন, 'এ কী করলে শিবানী। লোকটা যে মরে গেল।'

বরফ শীতল কণ্ঠে শিবানী বলে, 'মাথায় রিভলবারের গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় হলে কেউ বাঁচে না।'

কিন্তু এ তো খুন!'

'হ্যাঁ, তাই। ওটাই জগতের কাছে ওর শেষ পাওনা ছিল।'

'এখন কী হবে?'

'আমার সব ভাবা আছে। লাশটাকে এখুনি শোবার ঘরে নিয়ে যেতে হবে।'

'কিন্তু রঘু?'

'রঘুকে তিন ঘণ্টার মত কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি!'

'আর সব ঝি চাকরেরা?'

'আমি না ডাকলে ওরা কেউ আমাদের সামনে আসে না। ওর দেহটা এমন-কিছু ভারী নয়। তুমি একাই পারবে ওকে নিয়ে যেতে। যাও, আর দেরী কোরো না। আমাকে এদিকের কাজ করতে দাও।'

রামানন্দও ভেবে দেখলেন যা করার এখুনি করতে হবে নইলে আরো বেশী কিছু অঘটন ঘটতে পারে। রামানন্দ স্বাস্থ্যবান পুরুষ। ক্ষীণদেহী সোহনলালকে নিমেষে সে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। সটান চলে গেল শোবার ঘরে।

ব্যাকপিলোটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। ওটায় মুড়ে অত্যন্ত কাছ থেকে গুলি চালিয়েছিল শিবানী। ফলে রিভলভারের আওয়াজ শোনা যায়নি। কিন্তু পিলোটা এখুনি সরিয়ে ফেলতে হবে। সেন্টার টেবিলটা তাজা রক্তে থৈ-থৈ করছে। পিলোটা দিয়েই রক্ত মোছার কাজটা হয়ে গেল। টাকার বাণ্ডিলটা তুলে নিল অন্যহাতে। গভীর মনোযোগ দিয়ে আশেপাশের আর সবকিছু

ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেয় শিবানী। না, কোথাও আর কোনো বিসদৃশ কিছু চোখে পড়ছে না। রিভলবারটা কোমরে গুঁজে, একহাতে রক্তাক্ত বালিশ, অন্যহাতে সোহনের পরিত্যক্ত কাপ-ডিস নিয়ে শিবানীও দোতলায় চলে এল।

ওপরে এসে দেখে রামানন্দ নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। পায়ের কাছে সোহনের মৃতদেহ।

'বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকো না। খাটের গদীটা নামাও।'

রামানন্দ এখন আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে গদীটা তুলে ফেলেন। ডানলোপিলো তুলতে তেমন কোনো শক্তির দরকার হয় না।

'এবার ডালাটা তুলে ফেলো।'

মডার্ণ ডিভান-টাইপ খাট। লেপ কম্বল রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে গদীর নিচেই। এখন শীতের সময়। লেপ-টেপ বেরিয়ে গেছে। জায়গাটা ফাঁকাই ছিল। ডালা খুলে রামানন্দ নির্বাক দৃষ্টিতে তাকালেন শিবানীর দিকে।

'কি দেখছ বোকার মত। লোকটাকে এখন ওখানেই শুইয়ে দাও।'

রামানন্দ তাই করেন। এরপর ডালা নামিয়ে গদী-বিছানা পেতে দেন। বাইরে থেকে কেউ বুঝতেও পারবে না গদীর নিচে জমা আছে একটি সদ্যমৃত শরীর।

'যাও, এবার ভাল করে স্নানটান করে নাও। নইলে অফিসে দেরী হয়ে যাবে।'

'তুমি কী বলছ শিবানী? এখন অফিস যাব?'

'কেন, না যাবার কি হয়েছে?'

'কিন্তু বডিটা?'

'সব ভাবা আছে। এখন আর কথা বাড়িও না, আমায় অনেক কাজ সারতে হবে। আর শোন, আমি আজ অসুস্থ। সারাদিন শুয়েই থাকব। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তাই বলবে। আর একটা কথা, ঠিক ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবে।'

রামানন্দ এবার মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সারাদিন তুমি ঐ মড়াটাকে নিয়ে শুয়ে থাকবে?'

'আমার ভূতের ভয় নেই।'

তা জানি। কিন্তু লাসটা সরাবার কী ব্যবস্থা হবে বুঝতে পারছি না।'

'জগতে অনেক কিছুই তোমার অবোধ্য। এটাও বোঝার প্রয়োজন নেই।

তুমি কেবল যা বলব তা করে যাবে।'

বৃথা আর তর্কে গেলেন না রামানন্দ। কারণ তিনি চিরদিনই এই মহিলার পদানত। এই মহিলার বুদ্ধির কাছে তিনি বরাবরই খাটো। তাছাড়া চোখের সামনে একটি জলজ্যান্ত খুন দেখার পর তাঁর হাত পা তখনও কাঁপছে। আরো একবার নির্বোধ পাঁঠার মত রামানন্দ গৃহত্যাগ করলেন।

'ছেলেমানুষের মত কথা বোল না, প্রাথমিক কাজটা আমি করে দিয়েছি। শেষটা তোমাকেই করতে হবে, এবং নিখুঁত ভাবে।'

'কিন্তু আমি কী পারব? যদি কেউ দেখে ফেলে?'

'কাউকে দেখানোর মত কাজ এটা নয়। আর তুমি যতটা নার্ভাস হচ্ছ, ব্যাপারটা অত কঠিন নয়।'

'তুমি সঙ্গে থাকবে না?'

'তাহলে তোমাকে বাদ দিয়েই কাজটা আমি করে আসতাম।

এবার যা বলি মন দিয়ে শোন। বডিটা ব্যাকসিটের পাদানিতে শুইয়ে রেখে দেবে। সোজা গঙ্গার ধার দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও রাস্তা নির্জন পাবে। এখন শীতকাল। এত রাত্রে চট্ করে রাস্তায় কাউকে পাবে না। তারপর কোনো এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বডিটাকে রাস্তার ধারে নামিয়ে দেবে। ব্যস রিস্ক ঐটুকুই। নামবার সময়ে সাবধানে নামবে। যেন কারো চোখে না পড়ে।'

রামানন্দ একবার রিস্টওয়াচটা দেখলেন। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। শিবানীর কথায় তাঁর খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হল না।

অবয়বে ফুটে উঠল একটা দোনামোনা আর কিন্তু-কিন্তু ভাব। একটা বাসিমড়া নিয়ে একা গাড়ি চালিয়ে এই শীতের রাতে যেতে হবে—তার ওপর সবার অলক্ষ্যে দেহটা ফেলে দিতে হবে রাজপথে। রামানন্দর হাতটা ঘামতে শুরু করল।

'চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। এতে বিপদ বাড়বে। এত রাত্রে একজন মহিলার পক্ষে নির্জন রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাওয়া একটু রিস্কি। তুলনায় একজন পুরুষের পক্ষে ব্যাপারটা অনেক সহজ। তাছাড়া চাকরবাকরদের

কাছেও ধরা পড়লে কৈফিয়ৎ দেবার কিছু সঙ্গত ব্যাখ্যা থাকবে না। রাত বারোটায় তোমার বাড়ি ফেরা আর আমার বাড়ি ফেরায় অনেক তফাৎ।'

'জানি, কিন্তু বড় নার্ভাস লাগছে।'

'লাগতেই পারে। তবে এটাই শেষ কাজ।'

রামানন্দর আর বলার কিছু ছিল না। বললেও কোনো কাজ হতো না। শিবানীর কথাই শেষ কথা। তাঁর হাজার ভয় থাকলেও তাঁকে সোহনের মৃতদেহ নিয়ে এই রাতে বেরোতেই হবে। এবং কোনো এক নির্জন জায়গায় ফেলে দিয়েও আসতে হবে। তবু তিনি একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু শিবানী, বডিটা তো পুলিস পাবেই। তারপর যখন খোঁজ-টোঁজ নেওয়া শুরু করবে—'

'সে তো করবেই। তবে এ ধরনের বেওয়ারিশ লাশ নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে, পুলিসকে তাদের অন্যসব কাজ ছেড়ে দিতে হবে। তাছাড়া রাস্তায় লাশ পাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। আজকাল এসব প্রচুর হচ্ছে। পলিটিক্যাল মার্ডার তো লেগেই আছে।'

গ্রীষ্মকালে রাত সাড়ে এগারোটা এমন কিছু নয়। কিন্তু শীতকালে অধিকাংশ লোকই শুয়ে পড়ে। অথবা ঘরের বাইরে বড় একটা বের হয় না। ভবেশ ঘোষের বাড়ি এখন নির্জন। রঘু থেকে আরম্ভ করে বাকী সবাই শুয়ে পড়েছে। তাছাড়া তারা সবাই জানে দিদিমণির শরীর খারাপ। সকাল থেকেই তিনি শুয়ে আছেন। স্বাভাবিক কারণেই তারা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে শুতে চলে গেছে। বাড়ি নিস্তব্ধ।

তবু শিবানী একবার উঁকি দিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখে নিল। চতুর্দিক অন্ধকার। ডিভানের খোপ থেকে সোহনের দেহটা বার করা হয়ে গেছে। দেহটা কাঠের মত শক্ত। খুব সম্ভবত চোখ আর মুখ থেকে রক্ত বেরিয়েছিল। চোখের চারপাশে আর ঠোঁটের কষে রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। কালো কালো কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছে। মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন রামনন্দ। এই দেহটা নিয়ে এখন তাঁকে এক অকল্পনীয় দুর্ধর্ষ অভিযানে বেরুতে হবে।

শিবানী কিন্তু নির্বিকার। এমনিতে তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন তা আরো নির্বিকার। খুব সম্ভবত কর্তব্যের সংকল্পে। শিবানী এগিয়ে গিয়ে মৃতের দুটো হাত বেশ শক্ত করে চেপে ধরল। রামানন্দ ধরলেন দুটো পা। হাত-পা দোমড়ানো অবস্থায় থাকার জন্যে ওদের বয়ে নিয়ে যেতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু এখন ঐ সব অসুবিধার কথা ভাবলে চলবে না।

যেমন করেই হোক মড়াটাকে আজ রাতের অন্ধকারেই পাচার করে দিতে হবে। নইলে দুর্গন্ধেই সারা বাড়ির লোক টের পেয়ে যাবে।

মরলে মানুষের শরীর বেশ ভারী হয়ে যায়। রামানন্দ সেটা বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন। সব থেকে অসুবিধা হল সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময়। মড়ার পা ধরে সাবধানে নিচে নামতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বাধ্য হয়ে তিনি পা দুটো ছেড়ে দিলেন। শিবানীর কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে মৃতদেহটা একাই নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর নড়া দুটো ধরে প্রায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

গাড়ি অবশ্য আগেই বার করে আনা ছিল। বারান্দার নিচে। গাড়ি-বারান্দার আলো নেভানোই ছিল। রামানন্দ আগে এগিয়ে গিয়ে পিছনের দরজা খুলে গাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। একসময় শিবানী সোহনের দেহটা টেনে গাড়ির কাছে এসে থামল।

এই শীতেও রামানন্দ দরদর করে ঘামছিলেন। কিন্তু শিবানী যেন অদ্ভুত কোন ধাতু দিয়ে গড়া। অতবড় বিশাল শরীর নিয়েও কোন ঘাম বা ক্লান্তিজনিত কষ্টে তাকে কাতর হতে দেখা গেল না। নির্বিকার ভাবে দেহটি মাটিতে শুইয়ে, প্রথমেই পা-দুটো গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'এবার ভেতর থেকে টান।'

রামানন্দ তাই করলেন। তারপর দুজনের সমবেত প্রচেষ্টায় সোহনের দোমড়ানো দেহটি অত্যন্ত বীভৎস অবস্থায় ব্যাকসিটের পাদানিতে পড়ে রইল।

'তুমি এবার বেরিয়ে পড়। তাড়াতাড়ি এস। না ফেরা পর্যন্ত আমি চিন্তায় থাকব।

স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে রামানন্দ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শিবানী বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এতক্ষণ শিবানী থাকতে তাঁর ভয়ের ব্যাপারটা কিছু কম ছিল। কিন্তু ও চলে যেতেই রাজ্যের ভয় এসে জড়ো হল। অন্তত মিনিটখানেক গাড়ি স্টার্ট দেবার মত মানসিকতা হারিয়ে ফেললেন। তারপর সাময়িক দুর্বলতা কাটিয়ে ঠিক যে মুহূর্তে তিনি গাড়িতে স্টার্ট দেবেন, ঠিক তখনই অন্তত চার পাঁচটি শক্তিশালী টর্চের আলো এসে পড়ল তাঁর গাড়ির ওপর। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ তীব্র আলো রামানন্দর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। নিমেষে তিনি চোখের ওপর হাতের আড়াল দিলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে উঠল, সামনে বিপদ।

বিপদের যে একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছিলেন এটা তিনি আগেই বুঝতে

পেরেছিলেন। তবু শিবানীর ভরসায় এতদূর এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু বিপদ যে এত কাছাকাছি এসে গেছে তা বুঝতে পারেননি।

ঘোষ বাড়ির গাড়ি-বারান্দা থেকে গেট পর্যন্ত লম্বা টানা লাল সুরকি ঢালা পথ। দুধারে কিছু বাগান। তীব্র টর্চের আলোয় রামানন্দ সামনের দিকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর হাত তখনও চোখের ওপর চাপা। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছিল। শুনতে পাচ্ছিলেন বেশ কয়েক জোড়া ভারি বুটের আওয়াজ ক্রমশ তাঁর গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। রামানন্দ খুব সম্ভবত গাড়ি থেকে নেমে পালাতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় পালাবেন? তার আগেই তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন একটি শীতল নল জাতীয় বস্তু তাঁর রগ স্পর্শ করছে। এবং পরমুহূর্তেই শুনলেন, 'পালাবার চেষ্টা করবেন না মিঃ রামানন্দ বাসু। সোহন-লালকে খুন করা এবং তাঁর মৃতদেহ পাচার করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। চৌবেজি, দেখুন তো, লাশটা খুব সম্ভবত গাড়ির ব্যাকসিটেই রয়েছে।'

একটু পরেই শোনা গেল, হাঁ জি। ইধার এক আদমীকা লাশ গিরা হুয়া হ্যায়।'

ভবেশ ঘোষের বিশাল বাড়ির বিশাল হলঘরের সোফার ওপর জড়সড় হয়ে বসে আছেন রামানন্দ। অন্য সোফায় শিবানী দেবী। রামানন্দর পিছনে ও শিবানীর পিছনে একজন করে কনস্টেবল, ওদের হাতে উদ্যত রিভলবার। সামনে দাঁড়িয়ে নীল ব্যানার্জী আর বিকাশ তালুকদার। হলঘরের সব আলো জেলে দেওয়া হয়েছে। চাকরবাকরেরা সব অন্য ঘরে প্রায় বন্দী। তাদের হয়ত আলাদা ভাবে কিছু জেরা-টেরা করা হবে।

একক সোফায় বেশ আরাম করেই বসেছিল শিবানী। তার ভাবলেশহীন মুখে এখনও কোনো অভিব্যক্তি নেই। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই সে বলছিল, 'ওকে আপনারা ছেড়ে দিন মিঃ ব্যানার্জী। উনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'তা কেমন করে হয় মিসেস বোস, উনি যে বামাল সমেত হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন।'

'হতে পারে, কিন্তু—' ঠাণ্ডা গলায় নীল বলে, 'আমাদের হাতেও কিছু প্রমাণ

আছে, অত্যন্ত প্ল্যানফুলি উনিই সোহনলালকে খুন করেছেন।'

'আর কী অভিযোগ আছে আপনাদের?'

আজ থেকে দেড় বছর আগে পার্ক স্ট্রীটের একটি ফ্ল্যাটে শর্মিলা প্যাটেল নামে এক মহিলাকে উনি খুন করেছিলেন।'

'প্রমাণ আছে?'

সামান্য হেসে নীল বলল, 'আপনি কী মনে করেন বিনা প্রমাণে আমরা এতদূর এগিয়েছি। বিনা কারণে আপনাদের হ্যারাস করতে এসেছি? পুলিসের কাছে একটি ক্যাসেট আছে, যে ক্যাসেটটি টেপ করা হয় আপনাদের ঘোষ কেমিক্যালসের ডিরেক্টরের ঘর থেকে। সেই ক্যাসেটে আছে মিঃ বোস এবং সোহনলালের কিছু কণ্ঠস্বর। যে কণ্ঠস্বর প্রমাণ করে আপনার স্বামী শর্মিলা দেবীর সঙ্গে গভীর ভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।'

'তা দিয়ে প্রমাণ হয় না উনি শর্মিলাকে খুন করেছিলেন?'

'না তা হয় না। তবে আরো একটি প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। অত্যন্ত নিখুঁত পরিকল্পনায় আপনারা স্বামী-স্ত্রী যুক্তি করে সোহনকে হত্যা করেছেন আজ সকালে। তারপর রাতের অন্ধকারে তার দেহটি ফেলে দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন শহরেরই কোনো সুবিধাজনক স্থানে, তাই না?'

বরফ-ঠাণ্ডা গলায় শিবানী বলে, 'কে বলল আপনাদের এসব কথা?'

নীলের ঠোঁটে সেই পুরনো ছোট্ট হাসি, 'এই টেপ-রেকর্ডারটায় অনেক কিছু কথা টেপ হয়ে আছে। আপনাদের জানা নেই, জানার কথাও নয়, সোহনকে আমরা কাল সকালেই অ্যারেস্ট করেছিলাম। সেই আমাদের সবকিছু জানাতে বাধ্য হয়। জানায় তার এ বাড়িতে আসার কথা। আর তখনি সে আমাদের দেওয়া এই ছোট্ট টেপটি সঙ্গে নিয়ে আসে। সেটি ছিল ওর পকেটে। ঠিক কথাবার্তা শুরুর আগেই আপনাদের অগোচরে সুইচ টিপে রাখে। সকালের সব কথাই এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য রাতের কথাগুলো নয়। কারণ ততক্ষণে টেপের দম ফুরিয়ে গেছে। সেগুলো আপনাদের মুখ থেকেই শুনে নেব। তবে যা টেপ করা আছে তাতেই রামানন্দবাবুর বিরুদ্ধে খুব সহজেই চার্জশীট তৈরি করা যায়। না রামানন্দবাবু, পৃথিবীর কোনো আদালত থেকেই আপনি খালাস পেতে পারবেন না। অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার যে আমাদের উঠতে হবে।'

রামানন্দ সেই যে মাথা নিচু করেছিলেন, এখনও পর্যন্ত সেইভাবে বসে আছেন। তিনি বলতে পারতেন তিনি কোনো খুনই করেননি। কিন্তু নীলের কোনো কথার প্রতিবাদ জানাননি। জানালে সত্যি কথা বলতে হয়। বলতে

হয় সোহনলালকে খুন করেছেন তার স্ত্রী।

বিকাশ তালুকদার এগিয়ে এলেন রামানন্দর কাছে, বললেন, 'শর্মিলা প্যাটেলের খুনী কে এটা আদালতে আপনিই জানাবেন। আপাতত আপনাকে সোহনের হত্যাকারী হিসেবে থানায় যেতে হচ্ছে। নিন উঠুন।'

রামানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। একবার তাকালেন শিবানীর দিকে। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'বেশ চলুন।'

বোধহয় রামানন্দ যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন, হঠাৎ শুনলেন তাঁর স্ত্রীর বরফ-ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর, 'দাঁড়ান মিঃ তালুকদার। অযথা একজন নির্দোষ লোককে নিয়ে আপনারা টানা-হেঁচড়া করছেন। ওঁকে ছেড়ে দিন। কোনো খুনই উনি করেননি।'

ঘুরে তাকালেন বিকাশ, বললেন, 'আপনি কী করে জানলেন আপনার স্বামী বাইরে কী করেছেন না করেছেন? কী করে জানলেন উনি খুন করেননি?'

'কারণ উনি আমার স্বামী। আপনাদের সবার থেকে ওঁকে আমি বেশী চিনি, জানি। একটু আগেই মিঃ ব্যানার্জী বললেন, সোহনের পকেটে আপনারা একটা টেপ রেখে দিয়েছিলেন।'

বিকাশ পকেট থেকে জাপানী ছোট্ট টেপটা বার করে বলেন, 'এই সেই ক্যাসেট।'

'হতে পারে। কিন্তু ওটা বোধহয় আপনারা শোনেননি?'

'কী রকম?'

'শুনলে আপনারা আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করতেন না!'

এবার নীলই এগিয়ে এল। অত্যন্ত শক্ত গলায় সে বলল, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন মিসেস বোস। ক্যাসেটটা আমরা এখনও শুনিনি। ওটা আপনার মুখ থেকেই শুনব বলে অপেক্ষা করছিলুম।'

ঠাণ্ডা এবং বেশ গম্ভীর গলায় শিবানী বলে, 'সোহনলাল নামের জানোয়ারটাকে খুন করেছি আমি।'

রামানন্দ প্রায় আর্তনাদের ভঙ্গীতে বাধা দিলেন, 'না, ও মিথ্যে বলছে। খুন করেছি আমি।'

'তুমি চুপ করো। কথার মধ্যে কথা বলা আমি পছন্দ করি না। শুনুন মিঃ তালুকদার, অত্যন্ত পরিষ্কার মাথায়, ভেবেচিন্তে, আমিই সোহনকে খুন করেছি। প্রমাণও আছে। ওর মাথায় যে বুলেটটা আটকে আছে সেটা আমার রিভলভার থেকেই খরচ করা হয়েছে। রিভলভারটা এখনও আমার ড্রয়ারে আছে।

রিভলভারে আমার হাতের ছাপ পাবেন। আমার খাটের নিচে একটা সোফাপিলো আছে। রক্তমাখা। রক্তটা সোহনের মাথার। পিলোর ওয়ারে আমার হাতের ছাপ পাবেন। এছাড়াও যে ক্যাসেটটা আপনাদের কাছে আছে সেটা শুনলেই বুঝতে পারবেন, খুনটা কে করেছে। ক্যাসেটটা শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমার স্বামী এ খুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। খুনের এক মিনিট আগেও উনি জানতেন না এমন একটা খুন হতে পারে।'

'সোহনলালকে আপনার খুন করার উদ্দেশ্য ?'

'লোকটা আমার স্বামীর ক্ষতি করতে চেয়েছিল। ও যতদিন বেঁচে থাকত ততদিনই আমার স্বামীর মান সম্মান বিপন্ন হতে থাকত।'

'আমি ঠিক এটাই অনুমান করেছিলাম,' নীল বলল, 'এবার একটা সত্যি কথা বলবেন মিসেস বাসু, দেখি আমার অনুমান সত্যি কিনা।'

'আপনি নিশ্চয়ই শর্মিলা প্যাটেলের কথা জানতে চাইছেন ?'

'আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।'

'শর্মিলার সঙ্গে আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠতা আমি তিন বছর আগেই জানতে পেরেছিলাম। আমার চোখকে ধুলো দেওয়া রামানন্দর পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ওকে বাধা দিইনি। আমি জানতাম ওর একটা বিরাট কষ্টের দিক আছে। বিবাহিত জীবন ওর কাছে মরুভূমির মত হয়েছিল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম, শর্মিলা ভালো মেয়ে নয়। ও রামানন্দকে কতটা আনন্দ আর সুখ দিতে পেরেছিল তা জানি না, তবে বেশ বুঝতে পারছিলাম রামানন্দ তলিয়ে যাচ্ছে। ওর চেকের অ্যাকাউণ্ট দিন দিন বেড়েই চলছিল। আমার একদিন মনে হল, শর্মিলা রামানন্দকে সম্পূর্ণ শুষে নিয়ে তাড়িয়ে দেবে। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির রামানন্দ সেদিনের দুঃখ রাখার জায়গা পাবে না। শর্মিলা কোনো ভালো আর ভদ্রঘরের মেয়ে হলে আমি হয়ত অন্য কোনো ডিসিশান নিতাম, কিন্তু…, হ্যাঁ মিঃ ব্যানার্জী, দেড় বছর আগে এক বৃষ্টিধারা বিকেলে, আমি শর্মিলার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। ও দরজা খুলে নিজেই আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর '

রামানন্দ যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'শিবানী!'

'হ্যাঁ রামানন্দ, ওর হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্যেই ওকে আমি খুন করেছিলাম। বৃষ্টি এত জোরে পড়ছিল, গুলির শব্দ কেউই পায়নি। ধীরে-সুস্থেই আমি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। অবশ্য সেই সন্ধ্যায় তুমিও সেখানে গিয়েছিলে। বাড়ি ফিরে ভেবেছিলাম তোমায় ফোন করে সোজা বাড়ি চলে আসতে বলব। কিন্তু তার আগেই তুমি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিলে। ভাগ্য ভালো, কেউই

তোমার আসা-যাওয়াটা টের পায়নি।'

রামানন্দ কোনোমতে বলতে পারলেন, 'শর্মিলা খুনের কথা তো তুমি আমায় আগে জানাওনি।'

'আগ বাড়িয়ে কিছু বলা, আমার স্বভাবের বাইরে, তাছাড়া তোমাকে জানানোর কোনো প্রয়োজন দেখিনি। মিঃ তালুকদার, এবার নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে আপনারা ছেড়ে দেবেন?'

এবারও নীল বলল, 'বোধহয় না। কারণ দ্বিতীয় খুনের সবকিছু প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও উনি মৃতদেহ অন্যত্র পাচার করতে চেয়ে খুনকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আইন কি আপনার স্বামীকে ছেড়ে দেবে? আমার জানা নেই।'

'হুঁ', বলে শিবানী সামান্য সময় চুপ করে রইলেন, তারপর বলল, 'ভালো কথা, স্ত্রী হিসেবে সুখে দুঃখে আমার স্বামীর প্রতি আমার যা কর্তব্য তা করেছি। এবার আইন তার কর্তব্য করুক। চলুন কোথায় যেতে হবে।'

'আসুন', বলে বিকাশ তালুকদার এগিয়ে গেলেন। পিছনে রামানন্দ, আর শিবানী। তারও পিছনে আর সবাই।

সারা অফিস যখন তোলপাড়, ঘোষ কেমিক্যালস-এর ছোট বড় সব কর্মচারী যখন ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল, তারা যখন ভাবিত দুই কর্ণধারের অনুপস্থিতে কোম্পানীর কী হাল হবে, তাহলে কিন্তু আর একজন মানুষের মধ্যে অন্যতর এক চিন্তা। সে শ্যামদুলাল। রামানন্দর প্রতি ঈর্ষায় বিদ্বেষে সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল ঠিকই, চেয়েছিল রামানন্দর পতন, চেয়েছিল একটি অনাবিষ্কৃত সত্যকে জানতে। কিন্তু এ কী হলো? এতো সে চায়নি। এ সত্যটুকু বোধহয় না জানলেই ভালো হত।

নানান বিশৃঙ্খলতার মধ্যে সারাদিন অফিসে কাটিয়ে সে আজও এসেছে গঙ্গার ধারে। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া নামছে ধীরে ধীরে। গঙ্গা থেকে বয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্যামদুলালের মনে হল, কী দরকার ছিল তার উপযাচক হয়ে গোয়েন্দার কাছে যাওয়ার, কী দরকার ছিল আসল সত্যটুকু জানার তাগিদে গোপনীয় ক্যাসেটটি পুলিশের হাতে তুলে দেবার? কীইবা হবে রামানন্দর, বড় জোর ক' বছরের জেল। কিন্তু অন্ধকার চিরে যে সত্যটুকু বেরিয়ে এল, এখন মনে হচ্ছে বড় অকৃতজ্ঞের কাজ করা হয়ে গেছে। পিতৃপ্রতিম ভবেশ ঘোষ চেয়েছিলেন মেয়েকে সুখী করতে, চেয়েছিলেন তাকে সংসারী করতে। করেও গিয়েছিলেন। আর সেই ঘরটুকু, অকৃতজ্ঞের মতো সে ভেঙে দিল।

শিবানীকে তার খুনী মনে হয় না, মনে হয় সে এক অসাধারণ চরিত্রের মহিলা। পতিব্রতার অন্য নাম বুঝি শিবানী। এটাই বুঝি শিবানীর সম্বন্ধে শেষ সত্য কথা। আইনের চোখে শিবানী হয়ত দোষী হবে কিন্তু তার চোখে শিবানী আরো অনেক বড়ো, আরো অনেক মহিয়সী নারীর জায়গা করে নিল। অন্ধকারের বুকে এই সুন্দর সত্যটুকুকে উপলব্ধি করতে করতে সে বুঝতে পারছিল এবার থেকে তার রোগটা নিশ্চয় সেরে যাবে কেননা আর তার কোন ঈর্ষা নেই, নেই কোন বিদ্বেষের জ্বালা। আর বোধহয় তার মনের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া কোন সত্যকে জানার জন্যে গোয়েন্দার দ্বারস্থ হতে হবে না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে শ্যামদুলালের মনে হল এ বোধহয় ভালোই হল, বোধহয় এটাই হওয়া উচিত ছিল।

নিমুলেয়া
খুন

দীপক মালহোত্রার বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন সেরে ফিরছিল নীল ব্যানার্জি আর বিকাশ তালুকদার। শখের গোয়েন্দা হিসেবে ইদানীং নীল ব্যানার্জি বেশ নামটাম করেছে। এটা আদপেই ওর পেশা নয়। কিন্তু বেশ কয়েকটা জটিল রহস্যের সমাধান করার পর আর খবরের কাগজের দৌলতে সেগুলো প্রকাশিত হলে শখের গোয়েন্দা হিসেবে ওর নাম ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। ফলে ঠেকায় পড়ে অনেকেই ওর শরণাপন্ন হয়। রহস্য আর সমাধান দুটোই নীলের কাছে বেশ উদ্দীপনাময়। জোরালো টনিকের কাজ করে।

সেরকম আকর্ষণীয় কোন রহস্য ওর কাছে এলে ও কিছুতেই না বলতে পারে না। দীপক মালহোত্রার বাড়িতে নেমন্তন্নের সূত্র ঐ রহস্য সমাধান করতে গিয়েই। দীপকদের পারিবারিক সোনার বিগ্রহ হঠাৎই চুরি যায়। দিশেহারা দীপক পুলিশী তদারকি ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে নীলের শরণাপন্ন হন। শেষ পর্যন্ত নীলের বুদ্ধি এবং কৌশলে সে বিগ্রহ খুঁজে পাওয়া যায়। আহ্লাদিত দীপক কেবল উপযুক্ত পারিশ্রমিক নয়, এক বিশেষ ভোজের আয়োজন করেন। নীল সেখানে প্রধান আমন্ত্রিত ব্যক্তি। কেবল নীল নয়, আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বিকাশ তালুকদারও। তালুকদার হচ্ছেন পুলিস অফিসার। অনেক পুলিশ অফিসার শখের গোয়েন্দাদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। তালুকদার তাঁদের দলে নন। নীলের কার্যকলাপে উনি বলতে গেলে এরকম নীলের ভক্ত। আলাপ-পরিচয় হবার পর থেকেই তালুকদার ক্রমশ নীলের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে তো প্রায় বন্ধুর মত হয়ে যান।

তালুকদার নিজে জানেন তাঁর ক্ষমতার দৌড় কতদুর। তিনি জানেন তাঁর বুদ্ধি নিয়ে তিনি পুলিশ লাইনে খুব উল্লেখযোগ্য কিছু ভেল্‌কি দেখাতে পারবেন না। নিজের মুখেই তা স্বীকার করেন। গুণীর কদর করতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই। তালুকদারের কাছে নীল বেশ গুণী ব্যক্তি।

কথাবার্তায় গল্প-গুজবে দীপকের বাড়িতে ভোজ সারতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য চিন্তার কিছু ছিল না। একজন নিজেই পেশাগতভাবে পুলিস, আর অন্যজন পুলিশের খুব কাছাকাছি। চোর ডাকাত খুনী নিয়ে দুজনেরই কাজ-কারবার। রাত-বিরেতের ভয় দু'জনের কারোরই নেই। তার ওপর সঙ্গে ছিল নীলের মরিস মাইনর।

গাড়ি চালাচ্ছিল নীল। পাশেই বসেছিলেন তালুকদার। শীত এখন যাই-যাই করছে। বাতাসে বসন্তের এলোমেলো হাওয়া। রাস্তাও বেশ ফাঁকা। কারণ ঘড়িতে তখন প্রায় বারোটা বাজে। দু'পাশে ঘন গাছগাছালির মধ্যে পিচঢালা মসৃণ পথ। নীলের মত পাকা ড্রাইভারের হাতে স্টীয়ারিং থাকায় বিকাশ তালুকদার সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আরামে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন সিটের গায়ে। বোধ হয় তন্দ্রাও এসেছিল। গুন গুন করে একটা কলি ভাঁজতে ভাঁজতে আসছিলেন। এক সময় তা থেমে গিয়ে সামান্য ভোঁসভোঁস শব্দও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎই সজোরে গাড়ি ব্রেক কষাতে তালুকদারের তন্দ্রা আহত হল। ত্বরিতে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'এনিথিং রং ব্যানার্জি? গাড়ি থামালেন কেন?'

নীল ততক্ষণে ওর গাড়িতে রাখা চৌকো এভারেডি টর্চটা তুলে নিয়ে সামান্য দূরে একটা তেঁতুলগাছের নিচে আলো ছড়িয়ে কী যেন দেখছে।

তালুকদার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যানার্জি, কী দেখছেন অমন করে?'

'আপনিও দেখুন না···ভালো করে দেখুন। সামনের গাছতলায়।'

ততক্ষণে তালুকদারের তন্দ্রা একেবারে ছুট্। সামান্য চোখ কচলে ভাল করে তাকিয়ে বললেন, 'মাই গুডনেস! একটা বডি পড়ে আছে মনে হচ্ছে!'

নীল বলল, 'হ্যাঁ তাই। একটা বডি উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।'

'মাতাল-টাতাল নয় তো?'

'হতেও পারে। নামবেন নাকি?'

'এত রাত্রে? মাতাল-টাতাল হলে সামাজিক দায় হিসেবে ওকে আবার থানায় নিয়ে যেতে হবে।'

'আপনি এড়িয়ে গেলে আমার আর কী? চোর-ছ্যাঁচোড় এসে ওকে লুটেপুটে নেবে।'

'নিক্, ব্যাটাচ্ছেলের তাই নেওয়াই উচিত।'

'তাহলে বলছেন আমরা দেখিনি ওকে?'

'তাই বা কেমন করে বলি? গায়ে এখনও পুলিশি কোর্তা আর সরকারী তক্‌মা রয়েছে। চলুন দেখা যাক। ব্যাটাকে এমন প্যাদান প্যাদাবো না, জন্মের মত মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে। দিন, টর্চটা আমার হাতে দিন।'

টর্চ নিয়ে তালুকদার নেমে পড়লেন। নীলও নেমে এগিয়ে গেল তেঁতুলগাছের দিকে।

উপুড় হয়ে পড়েছিল দেহটা। একটা হাত ছড়ানো। অন্য হাতটা দেহের আড়ালে। তালুকদার সরাসরি দেহের ওপর টর্চের আলো ফেললেন। খুব সম্ভবত উনি ধাক্কাটাক্কা দিতে এগোচ্ছিলেন, হাত তুলে নীল বলল, 'দাঁড়ান তালুকদার—আগে একটু ভালো করে দেখে নেওয়া যাক।'

অতঃপর আগাপাশতলা টর্চের জোরালো আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বছর বত্রিশ-তেত্রিশের মধ্যেই বয়েস। জামাকাপড়ও বেশ শৌখিন। গাঢ় লাল রঙের ফুলহাতা পুলওভার। কালো প্যাণ্ট। পায়ে বাটার অ্যামবাসাডার। ছড়ানো হাতে একটা রিস্টওয়াচ। দেখে ভদ্রঘরেরই ছেলে মনে হয়।

দুজনেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখার পরই তালুকদার বলে উঠলেন, 'কেস গড়বড় মনে হচ্ছে, ব্যানার্জি!'

'কী রকম?'

'মরেটরে যায়নি তো!'

'আই ডাউট সো। পাল্‌সটা দেখুন তো?'

তালুকদার উপুড় হয়ে বসে পড়লেন। ছড়ানো বাঁ হাতটির নাড়ি টিপে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'গেছে। নাড়ীর সাড়া-শব্দ নেই। বডিও প্রায় ঠাণ্ডা।'

নীল কিছু না বলে ধীরে ধীরে দেহটার পাশে বসে পড়ল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখতে দেখতে কাত হওয়া মুখের কাছে মুখ এনেই বলল, 'মাই গুডনেস্‌। হিয়ার ইজ দ্য উণ্ড। টর্চটা দিন তো!'

টর্চের তীব্র আলো ছড়িয়ে পড়ল মুখের ওপর। রগের কাছটা ফুলে গেছে। ফেটেও গেছে। কিছুটা চাপা রক্তের দাগ। প্রথম দেখায় যা অনুমান করা যায় তা হল কোন ভোঁতা এবং ভারি কিছু দিয়ে রগের ওপর আঘাত করা হয়েছে।

'মার্ডার?' তালুকদার সামান্য অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'হতে পারে। পুলিশ হিসেবে এই মুহূর্তে ওর বডি ছোঁয়ার অধিকার আপনার আছে। দেখুন তো, কোন আইডেন্টিটি পাওয়া যায় কিনা।'

নীল উঠে পড়ল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আশপাশ বেশ খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। ইতিমধ্যে তালুকদার যুবকটির পকেট হাতড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। হিপ পকেট থেকে বের হল একটি মনিব্যাগ। শৌখিন ব্যাগ। অন্য পকেট থেকে সিগারেট লাইটার। ডান দিকের পকেটে একটি রুমাল।

মনিব্যাগ খোলার আগে অন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে গিয়ে হঠাৎ শরীরের নিচে চাপা পড়া ডান হাতটি টেনে বার করতেই চমকে উঠলেন তালুকদার। তারপর নীলের উদ্দেশে বললেন, 'ব্যানার্জি, ছেলেটার হাতে কী একটা কাগজ গোঁজা আছে…', বলেই তালুকদার মৃতের হাতের মধ্যে গোঁজা ভাঁজ করা কাগজটি টেনে নিলেন। মেলে ধরলেন চোখের সামনে। মাত্র দুটি কথা লেখা আছে কাগজের ওপর, 'চপলের হত্যাকারী'।

ততক্ষণে নীল কাছে এসে পড়েছে। তালুকদার ওর দিকে কাগজটা এগিয়ে দিলেন। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নীল বলল, 'ব্যাগে দেখুন তো, কোন নাম-ঠিকানা আছে কিনা।'

ব্যাগ খুলেই পাওয়া গেল নামঠিকানা। নির্মল সাহা। সল্ট লেকের একটা ঠিকানা। পাওয়া গেল কিছু টুকিটাকি কাগজপত্র। একটা লণ্ড্রীর বিল। নাম-করা একটা চীনে রেঁস্তরার পুরনো বিল। সত্তর টাকা কুড়ি পয়সার বিল। বিলটা কয়েকদিন আগের। সিনেমার টিকিটের দুখানা ছেঁড়া অংশ। দামী আসনের টিকিট। পার্সে টাকা-পয়সাও ছিল। মোট একশ সাতাশি টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা।

'এগুলো দেখে কী মনে হচ্ছে আপনার?' প্রশ্নটা তালুকদারই করলেন।

'সে হিসেব-নিকেশ তো পরে আছেই। কিন্তু আপাতত কী করা?'

'আজ রাতে ঘুমের দফা গয়া করা ছাড়া আর তো তেমন কিছু চোখের সামনে ভাসছে না।'

নীল মৃদু হাসল। তারপর বলল, 'ঠিকই, কিন্তু রাত তো বেড়ে চলেছে, নিয়ারেস্ট থানাও তো বেশ দূর।'

'তাহলে?'

'সে চিন্তা তো আমারও।'

একটা গাড়িটাড়িও তো আসতে দেখছি না।'

'কী করবেন গাড়ি নিয়ে? থানায়-যাবেন?'

'হ্যাঁ, সে তো যেতেই হবে।'

'আমার গাড়ি নিয়ে চলে যান।'

'সে কী, আপনি ?'

'বডিটা তো নিঝুম মাঠে ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। কেসটা যদি সত্যিই মার্ডার হয় এবং ডেলিবারেট হ'লে খুনী বডিটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারে।'

'সেটা তো আগেও পারত।'

'মানছি পারত। এবং ওপন্ রাস্তায় যখন ফেলে যেতেই পেরেছে তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে ডেড বডি নিয়ে খুনীর মাথাব্যথা নেই। কিন্তু অন্য ভাবেও তো কিছু ঘটনা ঘটতে পারে।'

'কী রকম ?'

'চোর-ছ্যাঁচোড়েরও তো অভাব নেই। কিছু না পেয়ে নিদেনপক্ষে লোকটার শরীরে যা যা নেবার সেগুলোও তো বাটপাড়ি করতে পারে। তাতে তার কতটা লাভ হবে জানি না, তবে পুলিশের হয়ত কিছু মূল্যবান সূত্র হারিয়ে যেতে পারে।'

'রাইট য়ু আর। কিন্তু আমি গাড়ি নিয়ে চলে গেলে আপনাকে তো একা থাকতে হবে।'

'সো হোয়াট ?'

'বলেন কী মশাই ! এত রাতে, এই নির্জন জায়গায় একটা ডেড বডির সামনে আপনাকে একা রেখে চলে যাব ?'

'ভয়টা কিসের ?'

'ভয় মানে ইয়ে ··আমাকে বললে আমি থাকতুম না।'

নীল হেসে ফেলল, তারপর বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি নিয়ে চলে যান। ভূতের ভয়টয় আমার নেই। আর ধান্দাবাজ নিশাচরদের জন্যে···'

পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে তালুকদারের সামনে তুলে ধরল, 'ছটা গুলিই মজুত আছে। নিশানা আমার বাঘমারা। আর আপনাদের ক্যারাটের দৌলতে পাঁচ-ছটা শক্ত জোয়ানকে কাবু করা · '

'না না', বাধা দিলেন তালুকদার, 'সে আমি জানি·· তবে···'

'তবেটবে না···টর্চটা আমায় দিয়ে আপনি সব কাজটাজ মিটিয়ে তাড়াতাড়ি করে আসুন। একটা অসুবিধা আমার হবে। ঠাণ্ডার। আপনার আমার ব্র্যাণ্ড এক্ই। প্যাকেটটা আমায় দিয়ে আপনি আসুন।'

তালুকদার জানেন, নীল আবেগে কথা বলে না। যা বলে গুরুত্ব দিয়েই বলে। আর কোন কথা না বাড়িয়ে উনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

যাই যাই করলেও, নিশুতিরাতে, খোলা আকাশের নিচে, ঘন গাছগাছালির মধ্যে জম্পেস ঠাণ্ডা। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল [illegible] গাছের নিচে

একটু উঁচু ঢিপিমত জায়গায় গিয়ে বসল। কোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা মাফলারটা দিয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধা শুরু করল। আর কিছু নয়, ঠাণ্ডা থেকে মাথাটা আগে বাঁচানো দরকার।

সে ঘটনার পর প্রায় দিন পনেরো কেটে গেছে। ইতিমধ্যে কাগজে-টাগজে খবরটাও প্রকাশিত হয়ে গেছে। নির্মল সাহার খুনের ব্যাপারে যদিও নীলের একটা মানসিক তাগিদ ছিল, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে চাইছিল না নিজেকে জড়াতে। ওদিকে বিকাশ তালুকদারেরও কোন খবর নেই। থানায় ফোন করে জানা গেল বিশেষ ধরনের এক স্মাগলিং চক্রকে ধরবার জন্যে ওনাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছে।

চুপচাপ বসেই ছিল ও। কিন্তু বেশীদিন চুপ করে বসে থাকতে পারল না। নির্মল সাহার হত্যার ব্যাপারে ওকে জড়িয়ে পড়তে হল।

দিন পনের পর সন্ধ্যের মুখে এসে পড়লেন বিকাশ তালুকদার। লোকটার বুদ্ধি সামান্য কম। নিজের মুখে স্বীকার করতে ওঁর কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু কাজ-পাগল। নীলও লোকটাকে অপছন্দ করে না। নিজে থেকেই অবসর সময়ে নীলের বাড়ি এসে গল্প-সল্প করে কাটিয়ে যান।

এসেই চায়ের অর্ডার দিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন সোফার ওপর। পনের দিনের ব্যবধানে শীতের প্রকোপ বেশ কমে গেছে। চায়ের কাপটা মুখে তুলতে তুলতে বললেন, 'এদিকের খবর কি?'

নীল সিগারেট ধরিয়েছিল। টানতে টানতে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ দিকের খবর?'

'বাঃ, ভুলে গেলেন? সেই যে সেই নির্মল সাহা!'

'ও, সেই রহস্যময় মৃত্যু! সে খবর তো বলতে পারবে ঐ এলাকার লোকাল থানার ও. সি. মিঃ বরাট। আর এসব পুলিশি ব্যাপার। আমার তো খোঁজ রাখার দায় নয়।'

তালুকদার হাসলেন। তারপর বললেন, 'অন্য কেউ বললে মেনে নিতাম কিন্তু প্রায় চোখের সামনে দেখা রহস্যময় খুনের ব্যাপার পড়ে থাকা সত্ত্বেও নীল ব্যানার্জির কোন মানসিক দায় নেই, আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনাকে উড়িয়ে দিচ্ছি না—নির্মল সাহা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকি দেয় —কিন্তু কেউ তো আমায় এ ব্যাপারে আমন্ত্রণ জানায়নি।'

'আমন্ত্রণ এলো বলে। মিঃ বরাটের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। নানান রকম পলিটিক্যাল ঝামেলা নিয়ে উনি এখন হিমসিম খাচ্ছেন। কে এক নির্মল সাহা নিয়ে বোধহয় মাথা ঘামানোর সময়ও নেই। উনি হয়ত আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে কেসটা নেড়েচেড়ে দেখার অনুরোধ করবেন।'

'করলে করা যাবে।'

'তা না হয় হল, কিন্তু সত্যিই কী আপনি এ ব্যাপারে কিছু ভাবেননি?'

'তেমন কিছু নয়।'

'তবু...যা ভেবেছেন বলুন। আসলে কী জানেন, অন্য কোন অফিসার হলে ব্যাপারটা ভুলে যেতে বদ্ধপরিকর হত। অযথা দায় নিতে কেউই চায় না। কিন্তু আপনি তো আমায় জানেন। মনের মধ্যে একটা খিঁচ ঢুকলে আমার ভেতরটা কেমন যেন হাঁসফাঁস করে। যতক্ষণ না ব্যাপারটা পরিণতিতে আসে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাই না। এইজন্যেই আমার কোন উন্নতি হল না। বোকাদের কখনও উন্নতি হয় না।'

বিকাশবাবু তাঁর স্বভাব ফিরে পেয়েছেন। কথা শুরু করলে থামতে পারেন না। নীল ওঁকে থামাল, 'আপনি কি জানতে চাইছেন?'

'আপনি যা ভেবেছেন।'

'ওর সম্বন্ধে বিশেষ কোন খোঁজখবর তো নিইনি। তবে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয়, ভদ্রলোক মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চেহারায় মার্জিত। হাতে দামী রিস্টওয়াচ, বেশ সৌখিন জামাকাপড়, মনিব্যাগে অতগুলো টাকা। দামী টিকিটে সিনেমা যাওয়া, চীনে হোস্টলে খাওয়া-দাওয়া—'

'তুর মশাই, চীনে হোটেলের কথা আর বলবেন না। হুজুগে বাঙালি। পালাপার্বনেও এখন সবাই দল বেঁধে চীনে হোটেলে খেতে যায়। পাড়ার মোড়ে মোড়ে এখন ঠ্যালাগাড়িতে রেপসিড দিয়ে চাউমিন তৈরী হয়।'

'তা হয়ত হয়। তবে মনে রাখবেন, নির্মলবাবু দল বেঁধে খেতে যাননি। গিয়েছিলেন মাত্র তুজনে। এবং নামকরা অভিজাত হোটেলে।'

'কী করে বুঝলেন তুজনে গিয়েছিল?'

'ওনার পকেটে যে রেঁস্তরার বিল ছিল, আমি জানি ওখানে সব খাবারেরই দাম বেশী। তিন প্লেট খাবার নেওয়া হয়েছিল। বিলটা আপনি মন দিয়ে দেখেছিলেন কিনা জানি না, আমি দেখেছি—তুটো চিকেন চাওমিন আর একটা ফ্রায়েড

প্রণ। অনুমান করা যেতে পারে এই খাবার মাত্র দুজনেই খেতে পারে।'

'অনেক সময় কিন্তু দু প্লেট খাবার নিয়ে তিনজনে ভাগ করে খাওয়া যায়।'

'অস্বীকার করছি না। খেতে পারে। খায়ও। তবে আরো একটা জিনিস মনে রাখবেন, ঐ একই দিনে দেখা দুটো ম্যাটিনী শোর টিকিটও ওঁর পকেটে ছিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে কোন একজনের সঙ্গে নির্মলবাবু দুপুর থেকে কাটিয়েছেন। সিনেমা দেখেছেন, রেস্তর াঁয় খেয়েছেন। এমনও হতে পারে খাওয়া-দাওয়ার পর ঐ নির্জন মাঠে ঘোরাঘুরি করেছেন। তারপর সেই বন্ধুটির সাক্ষাতে অথবা অসাক্ষাতে উনি নিহত হয়েছেন।'

'তার মানে আপনার কল্পনা যদি সত্যি হয় এই বন্ধুটিকে তো আমাদের আগে খুঁজে পাওয়া দরকার?'

হ্যাঁ, দরকার। কিন্তু কাজটি রীতিমত কঠিন।'

'আচ্ছা কোন মেয়ে বন্ধুটন্ধু হতে পারে কী?'

'সেটাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু আপনার ঐ চিরকুটটা! কে এই চপল? নির্মলের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী? কোন এক চপল কোন একদিন খুন হয়েছিল। নির্মলের হত্যাকারী জানাতে চাইছে, নির্মলই চপলের হত্যাকারী। এবং সেই হত্যার প্রতিশোধ সে নিয়েছে নির্মলকে হত্যা করে। আচ্ছা এটা পলিটিক্যাল মার্ডার নয় তো?'

'পলিটিক্যাল মার্ডার আরও ওপন্ হয়। হিসেব-নিকেশ করে গুছিয়ে রগের পাশে টিপ করে মারা—।'

'হয়ত কোন শাবল-টাবল দিয়ে পেছন থেকে মেরেছে—অ্যাকসিডেন্টালি সেটা গিয়ে রগে লেগেছে···হতে পারে না?'

'পারে, তবে অস্ত্রটা ঠিক শাবল না, তাহলে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত, অন্য কিছু হতে পারে। এই মুহূর্তে ধরা যাচ্ছে না। অস্ত্র অনেক সময় খুনীকে চিনতে সাহায্য করে।'

'আমার মনে হয়, নির্মলবাবুর বাড়ি একবার যাওয়া উচিত। ওনার বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপার-স্যাপারও জানা দরকার।'

'পি, এম. রিপোর্ট কী বলছে—জেনেছেন কিছু?'

'হ্যাঁ জেনেছি—অতর্কিত আক্রমণ। কোন শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে—জোর আঘাত, মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে।'

'হুঁ, ঠিক আছে। মিঃ বরাটকে বলুন আমায় একটা ফোন-টোন করতে

তারপর নয়··· ।'

'এ কেসটায় আমার ইন্টারেস্ট প্রচুর। আমিই সব ব্যবস্থা করছি।'

সেরাত্রে আর তেমন বিশেষ কিছু কথাবার্তা হল না। খানিক পরেই তালুকদার চলে গেলেন।

নির্মল সাহার বাড়ি সল্ট লেকে। এবি/১৫৫ নং সল্ট লেক খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ছিমছাম ছোটখাটো একতলা বাড়ি। সামনেই লোহার গ্রিলের দরজা। দরজা ভেজানোই ছিল। তিন ধাপ সিঁড়ির ওপরে এল-টাইপ ছোট্ট বারান্দা। বারান্দার লাগোয়া কাঠের দরজা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার গায়ে কলিং বেল। বেল টিপতেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

আপাদমস্তক নীলকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চান ?'

'এটাই তো নির্মল সাহার বাড়ি ?'

ভদ্রলোক সামান্য ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'আপনি আসছেন কোত্থেকে ?'

নিজের পরিচয় গোপন রেখে নীল বলল, 'অনেক দূর থেকে।'

'অ। তাই জানেন না। দিন পনের হল নির্মল মারা গেছে।'

'শুনেছি। সেই জন্যেই আসা। আপনি ?'

'আমি নিচের তলাটা ভাড়া নিয়ে আছি।'

'আই সি। তা ওঁদের কাউকে যদি····।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। মিনিট তিনেকের মধ্যে বছর ২৪।২৫ এর এক যুবক বেরিয়ে এলেন। পাতলা গড়ন। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। রঙটা খুব উজ্জ্বল। নীলকে দেখে সামান্য অবাকও হলেন। তারপর বললেন, 'আপনি জানেন আপনি কাকে চাইছেন ?'

নীল কিছু না বলে পকেট থেকে নিজের আইডেন্টিটি কার্ডটা এগিয়ে দিল। একবার চোখ বুলিয়ে কার্ডটা ফেরত দিতে দিতে যুবকটি বলল, 'পুলিশ তো এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার খোঁজখবর করে গেছে। তাছাড়া আমরা তো কেউ কোন প্রাইভেট ইনভেস্টিগটরকে খবর দিইনি।'

'আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। তার আগে আপনার পরিচয়টা জানতে পারি ?'

'আমি নির্মল সাহার ছোট ভাই। শ্যামল সাহা।'

'ভালোই হল। এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আমি ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারী তরফ থেকে নির্মলবাবুর ব্যাপারে কিছু খোঁজ-

খবর করার নির্দেশ এসেছে। তাই আপনাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে। অবশ্য যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

'না, ঠিক আপত্তি নয়, আসলে বড়দার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর, সত্যি বলতে কি, বাড়ির সকলে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। নানান অশান্তির মধ্যেও পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ তো আছেই। এর পরেও···আসলে কী জানেন, কোনকিছুর বিনিময়ে তো বড়দাকে আমরা ফিরে পাব না।'

'যিনি চলে যান, তাঁকে আর কখনোই ফিরে পাওয়া যায় না। তবে যাঁরা থাকেন তাঁদের কিছু অবশিষ্ট কাজ করতে হয়। আপনার দাদার মৃত্যুটা অস্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এবং একজন পুলিশ অফিসারই প্রথম আপনারই ভাইকে খুঁজে পাই। আমরাই প্রথম আবিষ্কার করি, আপনার দাদা খুন হয়েছেন। স্যাচারালি কিছু দায়িত্ব এসে যাচ্ছে। আমরা চাই খুনী ধরা পড়ুক। আপনি চান না?'

সামান্য সময় নিয়ে শ্যামল কিছু যেন ভাবল। তারপর বলল, 'আমাকে কী করতে হবে?'

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

'বেশ, আসুন। তবে একটা কথা, আমার বাবা-মা অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন। বিশেষ করে মা তো প্রায় শয্যাগত। এ অবস্থায় তাঁদের যদি টানা-হেঁচড়া না করেন···।'

'আমার জানার বিষয়গুলো জানতে পারলেই তাঁদের আর বিরক্ত করব না।'

'আসুন।' বলে শ্যামল নীলকে ভেতরে নিয়ে গেল।

বাড়ির মধ্যে আগাগোড়া বেশ রুচির ছাপ রয়েছে। মোজাইক সিঁড়ি। মানিপ্ল্যান্ট রেলিং বেয়ে উঠে গেছে দোতলায়। বারান্দার দেওয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রিন্ট কপি টাঙানো রয়েছে।

বারান্দায় উঠেই বাঁদিকের প্রথম ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল শ্যামল। এটাই বসার ঘর। সোফা সেট। ছোট কাচের সেন্টার টেবিল। ঘরের অন্যদিকে ডাইনিং টেবিল। চারদিকে চারটে চেয়ার। খুব সম্ভবত এটা খাওয়ার ঘর হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ঘরের এক কোণে একটা কালারড্ টিভি। টিভির সঙ্গে অ্যাটচ্ড্ বুক-শেল্ফ। বেশ কিছু দামী দামী বই-এ বুক-শেল্ফ ঠাসা।

সোফায় বসতে নীল বলল, 'বসুন, কয়েকটা জরুরী প্রশ্ন করব। ভ্রূটা কুঁচকে রেখেছেন কেন? পুলিশ থেকে এলেও আপনাকে বা আপনার পরিবারকে অসুবিধায় ফেলার জন্যে আমি আসিনি। এসেছি নিজের ইন্টারেস্টে। এসেছি আপনাদের মধ্যে জমে থাকা একটা জিজ্ঞাসার জট ছাড়াতে।'

উত্তরে শ্যামল বলল, 'আমি তো বললাম, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো—কেবল বাবা-মাকে বিরক্ত করবেন না।'

'আপনারা কজন? মানে....'

'বুঝেছি। আমরা তিন ভাই। বর্তমানে দুজন আর বাবা-মা। আর আছে ভোলাদা।'

'ভোলাদা কে?'

'এক কথায় কাজের লোক। তবে ওকে আমরা অন্য চোখে দেখি।'

আপনার আর এক ভাই কোথায়?'

'মেজদা,—কমল সাহা, মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। অফিস গেছে। ওর ডিউটি সকাল আটটায়।'

'আর আপনি?'

'আমি সি. এ. পড়ছি। এখনও চাকরির খাতায় নাম লেখাইনি।'

'নির্মলবাবু কী করতেন?'

'উনিও চাকরি করতেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। বাবা বাড়িতেই থাকেন। বছর পাঁচেক হল রিটায়ার করেছেন।'

'বাড়িটা বেশ নতুন মনে হল।'

'হ্যাঁ, রিটায়ার করার পরই এটার কাজ শেষ হয়।'

'আচ্ছা এবার একটু আপনার দাদার কথায় আসি। উনি খুন হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তা এ ব্যাপারে আপনাদের কী কাউকে সন্দেহ হয়?'

'সন্দেহ?' মাথা নাড়তে নাড়তে শ্যামল বললে, 'আমার দাদা খুব নিরীহ টাইপ। ব্যবহারেও বেশ ভদ্রলোক। চাকরিটাও নিতান্ত ফেলনা ছিল না। অফিসের পর সোজা চলে আসতেন বাড়ি। ঐ যে দেখছেন নানান ধরনের বইটই—সব বড়দার। বইটই পড়ে উনি সময় কাটিয়ে দিতেন। ইদানীং অবশ্য টিভি সিরিয়াল-টিরিয়াল দেখতেন। আমি অন্তত দাদাকে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখিনি।'

'ওনার বন্ধুবান্ধব?'

'অফিসের কোলিগ বন্ধু হয় কিনা জানি না। তাও উনি যে পোস্টে ছিলেন তাতে সাধারণ স্টাফের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশার সুযোগ ছিল না। এর বাইরে, তেমন কেউ, মানে যাকে বন্ধু বলা যায়, ছিল কিনা আমার জানা নেই।'

'চপল নামে কাউকে চেনেন?'

'চপল? নাঃ, ঐ নামে তো—'

'আপনার দাদার হাতে, আই মীন্ যখন আমরা ওনার দেহ খুঁজে পাই, ওনার হাতের মধ্যে ছোট্ট একটুকরো কাগজ পেয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল্—'চপলের হত্যাকারী' যার একটাই অর্থ, হত্যাকারী জানাতে চাইছে চপল নামে কাউকে উনি হত্যা করেছিলেন। যার প্রতিশোধ হিসেবে এই হত্যা।

'অ্যাবসার্ড। 'আমার দাদার কোন শত্রু ছিল কিনা জানি না, কেন তিনি খুন হয়েছেন তাও আমার অজানা, তবে দাদা করবেন খুন—নেক্স্‌ট্ টু ইমপসিব্‌ল!'

'এত জোর দিয়ে বলছেন?'

'কারণ তিনি আমার দাদা। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তাঁকে আমি দেখে আসছি। দাদার পক্ষে কাউকে খুন করা সম্ভব নয়।'

'উনি কী কোন পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?'

'কোনদিনও না।'

'আর একটা প্রশ্ন—ওনার কোন অ্যাফেয়ার্স ছিল কিনা জানেন?'

'ইউ মিন—লাভ অ্যাফেয়ার্স? ঠিক বলতে পারব না, তবে—'

'থামলেন কেন, বলুন?'

'প্রায় মাস ৫।৬ যাবৎ এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দাদার বোধ হয় কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়—।'

'কী রকম ঘনিষ্ঠতা?'

'ঠিক বলতে পারব না, তবে মহিলা প্রায়ই এ বাড়িতে যাতায়াত করতেন।'

'মহিলাকে দেখেছেন?'

'অতি সামান্যই। মাত্র একবারের জন্য।'

'তাহলে কী করে জানলেন, উনি প্রায়শই আসতেন?'

'মায়ের মুখে শোনা। দু'একবার মাকে এ নিয়ে ঠাট্টাটাট্টা করতেও শুনেছি।'

'কী রকম?'

'মার ধারণা, দাদা হয়ত সুমিত্রা দেবীকে বিয়ে-টিয়ে করবে।'

'মহিলার নাম সুমিত্রা?'

'মার কাছেই শোনা।'

সুমিত্রা দেবী থাকেন কোথায়?'

'জানি না। দাদা তো তেমন কিছু ভেঙে বলত না।'

'আপনার মা জানেন না?'

'না। কারণ মাকে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উত্তরে মা

বলেছিলেন, দাদা নাকি 'পরে হবে' বলে এড়িয়ে গেছে, আমিও আর এসব নিয়ে অনারশ্যক কৌতুহল দেখাইনি। বিশেষত দাদার ব্যাপার!'

'হুঁ'। বলে নীল সামান্য কিছু চিন্তা করল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার দাদা রোজই কি সকাল সকাল বাড়ি ফিরতেন?'

'সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর মাঝে মাঝে একটু রাত হত। তাও নটা সাড়ে নটার মধ্যেই চলে আসতেন।'

'আচ্ছা, আপনার দাদা মারা গেছেন প্রায় দিন পনের হতে চলল—তা এই খুন হবার ব্যাপারে সুমিত্রা দেবীর ভারশান কী? মানে ওনার কিছু সন্দেহ-টন্দেহর কথা বলেননি?'

'সুমিত্রা দেবী? আরে হ্যাঁ, তাই তো·· দাদা মারা যাবার পর একবারও তো দেখিনি। মনে এরকম একটা ওলটপালট অবস্থায়—এক মিনিট, আমি একটু মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।'

আধ মিনিটের মধ্যেই শ্যামল ঘুরে এসে বললে, 'না মিঃ ব্যানার্জি, এর মধ্যে আর তিনি আসেননি। আশ্চর্য, দাদা বেঁচে থাকতে শুনেছি প্রায়ই তিনি আসতেন—।'

'হয়ত এই মিসহ্যাপের খবরটা তিনি পাননি!'

'দাদার মৃত্যুর খবরটা লিডিং সব পেপারেই তো বেরিয়েছিল। তবুও তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম তিনি খবর পাননি, তাহলেও পনের দিনের মধ্যে একবারও আসবেন না?'

'ঠিক আছে, আরো কয়েকদিন দেখুন না। হয়ত তিনি কলকাতাতেই নেই। আর আপনাকে বিরক্ত করব না। কেবল দুটি ব্যাপারে একটু খেয়াল রাখবেন। এক, চপল নামে আপনার দাদার কেউ পরিচিত ছিলেন কিনা আর দু নম্বর, সুমিত্রা দেবীর ঠিকানা। এঁদের দুজনের খোঁজ পেলে আপনার দাদার মৃত্যুরহস্যের একটা সূত্র অন্তত পাওয়া যেত।'

'আপনি বলছেন, খবর পাবার চেষ্টা করব। কিন্তু কী লাভ? দাদা তো আর—।'

'জানি, কোন মৃত মানুষই ফিরে আসে না, কিন্তু অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত, কোন দোহাই দিয়ে একে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।'

'অহ্! আর একটা প্রশ্ন, আপনার দাদা কী ড্রিঙ্ক করতেন?'

'নাতো। অন্তত আমার জানা নেই। হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'পি. এম. রিপোর্টে, ওঁর পেটে মদের তলানি পাওয়া গেছে।'

'আশ্চর্য।'

'হ্যাঁ, আশ্চর্য, কারণ সে বিলটা তবে গেল কোথায় ?'

'কিসের বিল ?'

নীল নিজেকে সংযত করল। তারপর বলল, 'নাঃ তেমন কিছু না। ঠিক আছে।'

'আজ চলি। দরকার পড়লে আসব।'

নীল যখন বেরিয়ে এল তখন রোদের ঝাঁঝ বেশ বেড়ে গেছে।

নির্মল সাহার কেসটা যতটা সহজ হবে মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। নির্মলদের বাড়ি থেকে ফেরার পর প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। এর মধ্যে সামান্যতম সূত্র নীল খুঁজে বার করতে পারেনি। নির্মলের কর্মস্থলেও গিয়েছিল। সেখানেও শ্যামল সাহার কথার প্রতিধ্বনি। নির্মল অত্যন্ত নিরীহ নির্বিবাদী ভদ্রলোক ছিলেন। কখনোই কোন কারণে তাঁকে উত্তেজিত হতে বা কারো সঙ্গে 'ব্যাড বিহেভ' করতে কেউ দেখেনি। বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও তাঁর তেমন ছিল না। কোলিগদের সঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই মিশতেন। ইনট্রোভার্ট টাইপের মানুষ। নিজেকে নিজের মধ্যেই গুটিয়ে রাখতেন। চপল নামে ঐ ব্যাঙ্কে কেউই চাকরি করত না। মানুষের সঙ্গে দূরত্ব রেখে তিনি মিশতেন বলেই সহকর্মীরাও তাঁকে পারতপক্ষে এড়িয়েই চলতেন। অতএব তাঁদের পক্ষেও নির্মলের ব্যক্তিগত জীবনের খোঁজ রাখা সম্ভব হয়নি।

সুমিত্রা দেবী সম্বন্ধেও কোন খবর নেই। মেয়েটি যেন হঠাৎ এসে হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। এর মধ্যে নীল আরো একবার নির্মলের বাড়ি গিয়েছিল। নির্মলের মায়ের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছিল। সুমিত্রার ব্যাপারেও মহিলা বিশেষ কোন আলোকপাত করতে পারেননি। আর চেহারার যা বর্ণনা দিয়েছিলেন সেরকম মেয়ে সারা কলকাতায় বেশ কয়েক লাখ পাওয়া যাবে। ছিপছিপে ছোটখাটো চেহারা। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। রঙটা মাজা। অবশ্য চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল। ডানাকাটা পরী না বলে মোটামুটি সুন্দরী বলা যেতে পারে। একটু থেমে থেমে, ভেবেচিন্তে কথা বলে। ব্যাস। এই বর্ণনায় কোন এক সুমিত্রাকে খুঁজে পাওয়া অতি দুঃসাধ্য। অবশ্য নির্মলের মায়ের কাছ থেকে

সুমিত্রার বাসস্থানের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। সুমিত্রা নাকি বেলঘরিয়ার দিকে কোথাও থাকত। এই পর্যন্তই। বেলঘরিয়া তো একটুখানি জায়গা নয়। তবু খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মত বেলঘরিয়া রেল স্টেশন আর বাস স্ট্যাণ্ডে বেশ কয়েকদিন ধন্না দিয়েও ছোটখাটো চেহারার ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুলের কোন মোটামুটি সুন্দরীকে ও দেখতে পায়নি।

দুঃসাধ্য এবং অসম্ভব ঠিক করে নীল যখন ভাবছিল বিকাশ তালুকদারের কাছে গিয়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে আসবে, ঠিক সেই সময়েই একদিন ফোন এল বিকাশের কাছ থেকে। হতাশার ব্যাধিতে ভুগতে ভুগতে প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোন তুলেছিল নীল।

'আমি বিকাশ তালুকদার বলছি। নিশ্চয় ব্যানার্জি?'

'হ্যাঁ, বলছি···জরুরী তলব নাকি?'

'বলতে পারেন একরকম তাই। নির্মল সাহার কথা মনে আছে তো?'

'সেই হতাশায় তো ভুগছি।'

'এই মুহূর্তে খবর এল, সেম টাইপ মার্ডার—এবারে একটা নিরালা খালের ধারে। জায়গাটা আমারই এলাকায়।'

'ভাল, ঘুরে আসুন।'

'ধ্যাৎ মশাই, আমি তো যাবই, মানে যেতে বাধ্য, আপনি কী রিপোর্টার যে সংবাদ দেবার জন্যে ফোন করেছি—রেডি থাকুন। যাবার পথে তুলে নেব।'

'একটা নিয়েই তো হিমসিম খাচ্ছি।'

'অনেক সময় দুটোয় মাথা খুলে যায়। তাছাড়া নীল ব্যানার্জির কাছে এসব কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগে না। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমি আসছি।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে মিনিটখানেক গুম হয়ে বসে রইল নীল। নির্মল সাহা খুব ভোগাচ্ছে। কী হবে কে জানে। শেষ পর্যন্ত হয়ত কেসটা আনসল্‌ভ্‌ড্‌ রয়ে যাবে।

কী আর করা যায়। মীমাংসা হয়নি এমন বহু কেসই তো রয়ে গেছে পৃথিবীতে। নয় এ আর একটা বাড়বে। আসলে লুকনো সত্যকে খুঁজে পাওয়া অনেক সময় বেশ শক্ত কাজ হয়ে দাঁড়ায়। খুনী বেশীর ভাগ সময়ে কিছু না কিছু সূত্র ফেলে যায়ই। তার অন্যমনস্কতা আর সাময়িক উত্তেজনায়। কিন্তু সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত হত্যার সময় খুনী বেশ সজাগ থাকে। কোনো রাস্তাতেই কোন সূত্র ফেলে রাখে না। তবুও—হ্যাঁ ঐ 'তবু'টাই শেষ পর্যন্ত খুনীকে ধরিয়ে দেয়।

কেবল সেই 'তবু'টাকে খুঁজে পেতে বহু ক্ষেত্রে অনেক দেরি হয়ে যায়। নির্মল সাহার হত্যাকারীও নিশ্চয় কোথাও 'তবু'র ফাঁক রেখে গেছে। খালি চোখে যা ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু একদিন না একদিন সেই 'তবু'টাকে দেখা যাবেই। আসলে এই মুহূর্তে একটু ডাইভারশন দরকার। অনেক সময়ে অতি একাগ্রতায় আসল সূত্র চোখ এড়িয়ে যায়। দৃষ্টির অতি কাছাকাছি কিছু ছড়ানো থাকলে যেমন অনেক সময়ে তা দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়…। নাঃ এই মুহূর্তে নির্মল সাহা থেকে একটু দূরে সরে যাওয়া দরকার—। গা ঝাড়া দিয়ে নীল উঠে পড়ল।

মিনিটপাচেকের মধ্যেই ও তৈরী হয়ে নিল। বিকাশ তালুকদারের ঘড়ি বোধহয় কাঁটায় কাঁটায় সময় দেয়। ঠিক দশ মিনিটের মাথায় নিচে গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

অকুস্থলে পৌছতে বেশী সময় লাগল না। জায়গাটা বেশ নির্জন। দিনের বেলাতেও লোকজন বিশেষ যাতায়াত করে না। একদিকে একটা সরু খাল বয়ে গেছে। এমনিতে নির্জন হলেও খুনের মত একটা ঘটনা ঘটলে কিছু লোকজন বাতাসে তার খবর পায়। এবং ভিড় জমায়। একটা বুড়ো বটের নিচে জনা-আষ্টেক লোকের ভিড়। খালের ওপাশে কয়েকটা ঝুপড়ি রয়েছে। সেখানেও ছোটখাটো জটলা। খুব সম্ভবত ওরা দূর থেকে মজা দেখার লোক।

বিকাশ তালুকদার সঙ্গে দুজন কনস্টেবল এনেছিলেন। পুলিশের জীপ দেখে দু একজন এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে গিয়ে একসময় যে যার মত দূরে সরে গেল। অবশ্য একেবারে চলে না গিয়ে দূর থেকে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছায় রইল।

বিকাশ আর নীল মৃতদেহের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবং উভয়েই যুগপৎ চমকে দুজনের দিকে তাকিয়ে নীরবে কিছু কথাও বলে নিল। যার অর্থ চেনা দৃশ্য—দুবার দেখা। হ্যাঁ, তাই। নির্মল সাহার মত ঠিক একইভাবে বছর ত্রিশ-বত্রিশের এক যুবক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ। সবার আগে চোখে পড়ে একটি কাগজ গোল করে পাকানো অবস্থায় যুবকের হাতে গোঁজা। অন্য কিছু দেখার আগে তালুকদার পাকানো কাগজটি টেনে নেন। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নীলের দিকে এগিয়ে দেন। সবিস্ময়ে নীল দেখল এবারও লেখা আছে—'চপলের হত্যাকারী'।

'একজন চপলকে কজনে মিলে মেরেছে মশাই?'

কথাটা তালুকদার ঠাট্টা না সিরিয়াসলি বললেন বোঝা গেল না। তিনি তখন যুবকটিকে আপাদমস্তক দেখতে ব্যস্ত। যুবকটির পরনে পাজামা, পাঞ্জাবি আর

জংলা কাজের হ্যাণ্ডলুম জহরকোট। বেশ সুশ্রী। রঙটাও পরিষ্কার। একমাথা ঘন কোঁকড়া চুল। নীলও বেশ গম্ভীর হয়ে মৃতদেহটি দেখছিল। দেখতে দেখতেই বলল, 'কো-লিংকৃড। রগের পাশটা দেখুন। ঠিক যেমনভাবে নির্মল সাহাকে খুন করা হয়েছিল।'

'দেখেছি।' বলেই তালুকদার হাঁটু গেড়ে বসে মৃতের দেহতল্লাসী শুরু করলেন। মানিব্যাগ, রুমাল, সিগারেট, দিয়াশলাই আর কিছু কাগজপত্র। অন্য সব কিছু ছেড়ে তালুকদার প্রথমেই ব্যাগটা খুললেন। নাম দেখে তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। "শালা মরেছি রে" বলতে বলতে ব্যাগটা এগিয়ে দিলেন নীলের দিকে। নীলেরও ভ্রূ কুঁচকে উঠল। ঠোঁটের কোণে দেখা দিল অদ্ভুত ধরনের হাসি। স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে একটি নাম 'নির্মল সেন'। একসময় তাকে বিড় বিড় করতে দেখা গেল, 'প্রথমে নির্মল সাহা, তারপর নির্মল সেন।'

তালুকদার বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো ব্যানার্জি, দুটো মার্ডারই হুবহু এক।'

'হ্যাঁ, প্রি-প্ল্যান্‌ড্‌ মার্ডার। খুব ঠাণ্ডামাথায় একই ধরনের অস্ত্র দিয়ে দুটো খুন করা হয়েছে। আর যতদুর মনে হয়, মোটিভও এক। কোন এক চপলের জন্যে দুজনকে প্রাণ দিতে হল।'

'আর মজাটা হল কী দুজনেই নামই নির্মল।'

'তালুকদার, আপনি বরং আপনার পুলিশি ব্যাপারগুলো সারতে থাকুন, আমি দেখি দু-একজনকে পাকড়াও করে কিছু জানতে পারি কিনা।'

'দেখুন, মনে হয় না কেউ মুখ খুলবে।'

নীল সামান্য এগিয়ে গিয়ে একজন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যক্তিকে পাকড়াও করল। লোকটা পালাতেই চেয়েছিল, কিন্তু পারল না।

'আপনি এদিকেই থাকেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ সামনের বস্তিতে।'

'লোকটি খুন হয়েছে। ওকে চেনেন নাকি?'

'পাগল! দেখিইনি কোনদিনও।'

'আপনারা কেউ দেখেছেন নাকি?'

উপস্থিত যে দু-তিনজন ছিল তারা 'হ্যাঁ' 'না' কিছু না বলে উদাসীন হয়ে গেল।

'ওকে ওভাবে পড়ে থাকতে প্রথম কে দেখেছে?'

এবারও কারো মুখে কোন শব্দ নেই। হঠাৎ প্রথম লোকটির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বছরদশেকের ছেলে দুম্‌ করে বলে বসল, 'আমি দেখেচি বাবু।'

নীল ওর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যাবে, এমন সময় আগের লোকটি বাচ্চাটিকে

ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বলে, 'হারামজাদা, চ আগে বাড়ি, ছালচামড়া তুলে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসব। চল্ ঘরে চল্।'

লোকটা বাচ্চাটাকে নিয়ে বোধহয় চলে যেতে চাইছিল। বাদ সাধল নীল, 'দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। ওইটুকু ছেলেকে ওভাবে মারে নাকি?'

'না মারবে না, সোহাগ গেলাবে।'

'এত ভয় পাবার কী হল? আপনারা তো আর খুন করেননি! ওকে বলতে দিন।'

'কি আবার বলবে? বলার আছেই বা কী? চ ঘরে চ—আমায় আবার কাজে বেরুতে হবে।'

লোকটি পা বাড়িয়েছিল। নীল একটু অন্য পন্থা নিল। সবক্ষেত্রে নরম হলে হলে চলে না। একটু পুলিশি মেজাজ নিয়ে ও বলল, 'যাবেন না। তাহলে কিন্তু অন্য ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন। আচ্ছা খোকা, বল ত এবার, তুমিই ওকে প্রথম দেখেছ—তাই না?'

খোকাটি একবার বাবার দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায়।

'বল না ভয় কী?'

আবার লোকটিকে বলতে শোনা গেল, 'ও কিছু জানে না—আমরাও জানি না। পুলিশ বলে জোরজুলুম করবেন নাকি? চ।'

এবার আর ইতস্তত করার মত অবস্থায় ছিল না লোকটি। খোকার নড়াটি ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে খালের নিচে নেমে গেল। নীল দেখল লোকটি সেই পচা খালের স্বল্প হাঁটুজল ডিঙিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল। ওপারে গিয়েই দমাদ্দম বেশ কয়েকটা কিল-চড় কষাতে কষাতে ছেলেটাকে নিয়ে ঝুপড়িগুলোর ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল বাকী জনতাকে। নীল একবার মুচ্‌কি হেসে ফিরে গেল তালুকদারের কাছে।

'কিছু বার করতে পারলেন?'

'জনতা নির্বোধ নয়। অকারণ পুলিশি ঝঞ্ঝাটে যেতেও চায় না। ব্রিটিশ আমল থেকে আপনারা ওদের ওপর এত টরচার করেছেন, এখন ওরা সজাগ হয়ে গেছে। জানলেও কেউ কিছু বলবে না। ভয় দেখিয়ে মুখ খোলানোর অবস্থাটা পাল্টে গেছে। যাকগে, আপনার তো এখন অনেক কাজ। করুন। আমি চলি।'

'সে কী, এত তাড়াতাড়ি?'

'এই মুহূর্তে আমার কিছু করারও নেই। গোড়া থেকে একবার ভেবে দেখি। আলোটালো দেখতে পেলে জানাব।'

আর কিছু না বলে নীল একটু অভদ্রের মতোই চলে গেল। আসলে সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ভুগছিল সে।

দিনকয়েক পরের ঘটনা। ওদের ঝুলবারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসেছিল নীল। নির্মল সেনের মৃতদেহ আবিষ্কারের পর সেই যে ও বাড়ি ফিরেছিল, তারপর থেকে আর কোথাও বের হয়নি। নির্মল সাহা আর নির্মল সেন ওর মাথায় পাহাড়ের মত চেপে বসেছিল। সে পাহাড়টা ভাবনার। দুটো হত্যার মধ্যে কোন অমিল নেই। এবং দুটো একই লোকের দ্বারা এক অস্ত্রে সম্পন্ন হয়েছে। কী হতে পারে? কে এই চপল? দুই নির্মল মিলে চপলকে হত্যা করেছিল? তবে কি ওরা চার বন্ধু ছিল? চতুর্থ বন্ধুই দুই নির্মলকে খুন করল? কেন? কারণটাই বা কী? কোন নারীঘটিত ব্যাপার? তাহলে সেই নারীটি কোথায়? সে কি সুমিত্রা? বড় আশ্চর্য, প্রথম নির্মল হত্যার পর সুমিত্রা উধাও। নির্মল সাহার বাড়িতে পরে ফোন করে জেনেছিল সুমিত্রা আর আসেনি। এটা কেমন করে সম্ভব? শ্যামল সাহার কথা অনুযায়ী সুমিত্রার সঙ্গে নির্মল সাহার প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক থাকা সম্ভব। আর যদি তা নাও হয়, যদি নিছক বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয় — তাহলেও তো এতদিনের মধ্যে মেয়েটির অন্তত একবারও নির্মল সাহার বাড়ি যাওয়া উচিত ছিল। তবে কী সুমিত্রা জানে নির্মল সাহা খুন হয়েছে? পুলিশের ভয়ে আসছে না? নাকি সুমিত্রার সঙ্গে হত্যাকারীর কোন যোগাযোগ আছে? অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এই বিরাট কলকাতা শহরে কমন্ একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়াই তো ক্লান্তিকর হতাশব্যঞ্জক পরিশ্রম। এক কথায় সম্ভবও নয়।

এর মধ্যে বিকাশবাবুরও পাত্তা নেই। দ্বিতীয় খুনের দিন সন্ধ্যেবেলা একবার বিকাশবাবু ফোন করে জানিয়েছিলেন দু-একদিনের মধ্যে দেখা করবেন, বিশেষ কথা আছে। কিন্তু তারপর থেকে তিনিও নীরব। নীলও বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে চুপচাপ বসেছিল। নির্মল সেনের হত্যার খবরও কাগজে বেরিয়েছিল। নির্মল সাহারও উদ্ধৃতি ছিল। পুলিশের অক্ষমতার প্রতি মৃদু কটাক্ষও করা হয়েছিল। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই, তারপর আবার নীরবতা।

ইজিচেয়ারে অলসভাবে গা এলিয়ে দিয়ে দূরের বাগানের দিকে তাকিয়ে ও একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলছিল। সাধারণত যখন ও ভেতরে ভেতরে

উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তখনই ওকে এভাবে ঘন ঘন সিগারেট খেতে দেখা যায়। ঠিক এই সময়ে ও একজনের অভাব বেশ ফীল করছিল। সে হল ওর দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং সহযোগী অজেয় বসু। এমনিতে ও একটি কলেজের অধ্যাপক। তবে লেখালেখির ব্যাপারটাও সমানতালে চলে। আর চলে যে কোন রহস্যে নীলের সঙ্গী থাকা। এখন সেও নেই। কী একটা বিশেষ ধরনের লেখার ব্যাপারে মাসখানেকের জন্য আজমীর গিয়েছে। অজু থাকলে ওর সঙ্গে আলোচনা করেও অনেক সময় সমস্যার সূত্র খুঁজে পেয়েছে। এখন সে ব্যবস্থাতেও সঙ্গীহীন। এমন সময় দীনু মানে নীলের বাড়ির বহুদিনের পুরনো কাজের লোক এসে খবর দিল কে একজন বাবু এসেছেন ওর সঙ্গে দেখা করবেন বলে।

দীনুকে নীলের বলাই ছিল, খুব চেনা লোক না হলে যেই আসুক না কেন সে যেন 'বাবু বাড়ি নেই' কথাটা জানিয়ে দেয়। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে দীনু সে কথা বলেনি। নীল আর তর্ক বা তিরস্কারে গেল না। কেবল বলল, 'নিচে বসা, আমি যাচ্ছি।'

'আচ্ছা' বলে দীনু চলে গেল। নীল অগত্যা নিচে আসতে ব্যাধ্য হল। নীলকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

ওঁকে ব্যস্ত না হয়ে বসতে বলে নীল ওঁর সামনের সোফায় বসে জিজ্ঞাসু মুখে তাকাল।

'আপনিই নিশ্চয় নীলাঞ্জন ব্যানার্জী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

প্রায় বছর পঞ্চান্ন বয়েস হবে ভদ্রলোকের। হাফহাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা। গায়ে হাল্কা চাদর। পায়ে বাটার চটি। সাদামাটা চেহারা। মাথার সামনের দিকটা বিরলকেশ। চোখে ওয়াইনকালার ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা' হাতে নস্যির ডিবে। ডান হাতে তখনও একটা টিপ গরম হচ্ছে।

কথা শুরু করার আগে বাগানো টিপটি নাকের মধ্যে চালান করে রুমাল বার করলেন।

নাক পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'খুব বিশেষ দরকারে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

মৃদু হেসে নীল বলল, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই হয়। আপনার প্রবলেমটা বলুন।'

'কয়েকদিন আগে আমার একমাত্র ভাইপো খুন হয়েছে।'

'খুন? কীভাবে?'

'জানি না। তবে পুলিশ তাই বলছে।'

'অ। তা খুনটা হয়েছে কোথায়?'

'বেলেঘাটার দিকে একটা খালের ধারে।'

'নির্মল সেন?'

'হ্যাঁ, আপনি জানলেন কী করে?'

'ঘটনাচক্রে আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল।'

'তবে তো আপনি সবই জানেন। আপনারও ধারণা, নির্মলকে কেউ খুন করেছে?'

'হ্যাঁ তাই।'

'আমার একমাত্র ভাইপো নির্মল। আমি চাই যে ওকে খুন করেছে সে যেন ধরা পড়ে।'

'খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি তো পুলিশ নই। তাছাড়া পুলিশ অলরেডি আপনার ভাইপোর কেস টেক-আপ করেছে। শুধু আপনার নয়, নির্মল সাহা বলে আরো এক যুবক ঠিক একই ভাবে খুন হন। সেটাও পুলিশ দেখছে।'

নীল যে ইতিমধ্যেই নির্মল সাহার ব্যাপারে যুক্ত সেটি আর প্রকাশ করল না।

'মিঃ ব্যানার্জি, পুলিশ তার কাজ নিশ্চয় করবে। করুক। তবু, আপনার নাম আমি জানি। আপনার তদন্তের ব্যাপারও আমি কাগজে পড়েছি। পড়েছি আপনার বন্ধু অজেয় বসুর লেখায়। আপনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। প্লীজ, আপনি আর না করবেন না। দাদার অবস্থা আর চোখে দেখা যায় না। একে তো বৌদি চলে যাবার পর দাদা কেমন হয়ে গিয়েছিলেন, তার ওপব এই শোক।'

'আমার কাছে এসেছেন, তা কি আপনার দাদা জানেন?'

'না। জানলেও হ্যাঁ বা না কোন কিছু বলার মত এখন তাঁর অবস্থা নয়। কিন্তু দুঃখের মধ্যেও দাদার মত আমি ভেঙে পড়িনি। নিরুকে একরকম আমিই বুকে করে মানুষ করেছি। আমি চাই খুনীকে খুঁজে পেতে। একবার তার মুখটা দেখতে চাই, জিজ্ঞেস করতে চাই, কোন্ অপরাধে সে আমার নিরুকে খুন করল?'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'বিমল সেন।'

'চপল বলে কাউকে চেনেন? মানে আপনার ভাইপোব কোন বন্ধুবান্ধব কি ছিলেন ঐ নামে?'

খানিকক্ষণ ভাবার চেষ্টা করলেন বিমলবাবু। তারপর বললেন, 'না, এমন

নামের কাউকে আমি জানি না। তবে বয়স্ক ছেলে। ঘরকুনোও নয়। হয়ত কেউ ছিল, আমার জানা নেই।'

'আপনার ভাইপো, আই মীন নির্মল সেন তো চাকরি-বাকরি করতেন?'

'হ্যাঁ, ভালো চাকরিই করত। একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের পার্সনেল অফিসার।'

'কম্পানির নামটা বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?'

'না, না, আপত্তি কিসের! রয় অ্যাণ্ড সিং এণ্টারপ্রাইস। সংক্ষেপে আর. এস. ই.। নিশ্চয় নামটা শুনেছেন!'

'হ্যাঁ, শুনেছি। আচ্ছা, কোন পলিটিক্যাল ইনভল্‌ভ্‌মেণ্ট সম্ভবত ছিল না?'

'ঐ পোস্টে চাকরি করে সেটা তো সম্ভব নয়।'

'বিয়েটিয়ে করেছিলেন?'

'না। তবে পাত্রী ঠিক করেই ফেলেছিল। হয়ত তিন চার মাসের মধ্যে করে ফেলার প্ল্যানও ছিল।'

'পাত্রী উনি নিজেই ঠিক করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটিকে চেনেন আপনারা?'

'ঠিক চেনা বলতে যা বোঝায় তা নয়, তবে নিরু একদিন আমার আর দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।'

'মেয়েটির নাম জানেন?'

'নাম, নাম·· ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, প্রণতি মিত্র।'

'প্রণতি মিত্র! থাকেন কোথায়?'

'ব্যাপারটা কী জানেন, নিরু ওকে পছন্দ করেছিল। নিরুর ওপর আমাদের বিশ্বাস ছিল। হঠকারি কিছু ও যে করবে না সে জানতাম—তাই ঠিক ঠিকানা-টিকানা রাখার কথা ভাবিনি। তবে শুনেছিলাম বেহালার দিকে কোথায় যেন থাকে।'

'ওদের আলাপ হয়েছিল কতদিন, তা জানেন?'

'না। সে প্রয়োজনও মনে হয়নি। তবে ইদানীং মেয়েটি দু' তিন দিন অন্তরই আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করত।'

'স্বাভাবিক। আচ্ছা, নির্মল, মানে আপনার ভাইপো. মারা গেছেন প্রায় দিন, সাত-আট হয়ে গেল। এর মধ্যে কী প্রণতি দেবী আর এসেছিলেন?'

'যতদূর মনে পড়ে, তাকে তো একবারও দেখিনি।'

'একজ্যাক্টলি সেম!' নীল প্রায় স্বগতোক্তি করল।

'কিছু বললেন মিঃ ব্যানার্জি ?'

'উঁ, না, কিছু না।'

'দায়িত্বটা আপনি নিচ্ছেন তাহলে ? আপনার ফীজ কিন্তু এক পয়সাও কম দেবো না। টাকাটা নয় আপনি অ্যাডভ্যান্সই রেখে দিন।'

'না, সে কথা নয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে টাকার থেকেও আরো বড় একটা ব্যাপার লুকিয়ে আছে।'

'কী ?'

'সে আপনাকে বোঝানো যাবে না। ঠিক আছে আপনার কেস আমি নিচ্ছি। আপনি কেবল প্রণতি মিত্রের ঠিকানাটা জোগাড় করে দেবেন। মহিলার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।'

'আপনার কী মনে হচ্ছে প্রণতিই—'

'আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। প্রণতি দেবীকে দরকার এই কারণে যে যাঁকে নির্মলবাবু কিছুদিনের মধ্যেই লাইফ পার্টনার করতেন, নিশ্চয় তাঁর কাছে ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু রেখাপাত করে গেছেন। নির্মলবাবুর সেই ব্যক্তিগত জীবনটা জানা দরকার যা আপনার অজানা।'

'বুঝলাম। ঠিক আছে, আমি আজই দাদাকে জিজ্ঞেস করছি। আমার মেয়ে, মানে নিরুর বোনও নিরুর সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে—প্রণতির ঠিকানা ওর পক্ষেও জানা সম্ভব। আমি এখনই গিয়ে সব খোঁজ নিচ্ছি।'

'ঠিক আছে মিঃ সেন, আপনি আসুন। আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। ও হ্যাঁ, আপনার ঠিকানাটাই তো জানা হয়নি।'

বিমলবাবু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পকেট থেকে একটা খাম আর একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে ধরলেন নীলের দিকে, তারপর বললেন, 'আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। এটা রাখুন। অ্যাডভান্স আর ঐ কার্ডে আমার ঠিকানা।

খামটা হাতে নিয়ে কার্ডে চোখ বুলোতে বুলোতে নীল কেবল বলল, 'ধন্যবাদ।'

পরের দৃশ্য উন্মোচিত হল ছ'মাস পর! যদিও দৃশ্যের অন্তরালে ঘটে গেছে আরো অনেক ঘটনা। এক একটি ঘটনা পুলিশকে ফেলেছে আরো বিপাকে। খবরের কাগজগুলো তো পুলিশকে তার অকর্মণ্যতার জন্যে পথে বসিয়ে ছেড়েছে।

নীল পুলিশ নয়। কিন্তু একটির পর একটি ঘটনা তাকেও বেশ চিন্তিত করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, সেও ভেবে উঠতে পারছিল না পর পর নৃশংস খুনের যে ধারাবাহিকতা চলছে তার কিনারা কী ভাবে হবে! ঠিক এমনি সময়ে একদিন এলেন বিকাশ তালুকদার। হাতে একগাদা খবরের কাগজ। এ কদিনে ভদ্র লোকের প্রায় হাসিখুশিভরা মুখে কে যেন কালি বুলিয়ে দিয়েছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটি কোচের উপর এলিয়ে দিয়ে বসে পড়লেন। ভদ্রলোকের করুণ অবস্থাটি নীল বুঝতে পারল। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এমন একটি ভাব করে সে বলল, 'কী হল তালুকদার সাহেব? ঘর্মাক্ত কলেবরে, আবার কোন্ স্পট্ থেকে এলেন? মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন সামনে মেয়ের বিয়ে, আর ব্যাঙ্কের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খোয়া গিয়েছে!'

'ঠাট্টা করছেন? করুন। চাকরি তো করেন না। ওপরওলার ধ্যাতানি যে কি জিনিস তা কোনদিন বুঝতে হল না। করবেনই তো! ঠাট্টা আপনাদের মুখেই মানায়।'

'আরে তা নয়, তা নয়। কিন্তু এত বিমর্ষ কেন? বৌদির সঙ্গে এখন আড়ি পর্ব চলছে নাকি?'

'ধ্যাৎ মশাই! বৌদি-ফৌদি নিয়ে কে অত মাথা ঘামাচ্ছে!'

'তবে?'

'দেখুন··· এগুলো দেখুন।'

'খবরের কাগজ? সে তো রোজই দেখি। নতুন কিছু ঘটনা নেই। আর পাঁচটা মামুলি খবরের সঙ্গে বিশ দিন পচিশ দিন অন্তর একটা করে 'নির্মল' আত্ম বলি যাচ্ছে—এই তো?'

নীলের মুখে এমন সিরিয়াস কথা এমন হাল্কাভাবে শুনবেন তা বিকাশবাবু আশা করেননি—বেশ অবাক হয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা আপনার কাছে মজাদার মনে হচ্ছে!'

'ছি ছি, এ কী বলছেন—মানুষের মৃত্যু, মানে আততায়ীর হস্তে নির্মম এবং শোচনীয় অপরিণত মৃত্যু কী কখনও মজাদার হতে পারে?'

'তাহলে? এত রসিকতার অর্থ?'

'খবরের কাগজঅলার মত আমারও যে বলতে ইচ্ছে করছে···আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই পড়ে শোনাচ্ছি,' এই বলে টেবিলের ওপর রাখা বিকাশ আনীত খবরের কাগজগুলো একটা করে টেনে পড়তে শুরু করল, 'অদৃশ্য আততায়ীর হস্তে নির্মমভাবে যুবক খুন! নাম নির্মল সাহা। বয়েস আনুমানিক ৩২।৩৩। মৃতের

হাতে পাওয়া গেছে একটি চিরকুট—তাতে লেখা আছে—"চপলের হত্যাকারী"....
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাশে নামিয়ে অন্য কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল, 'অদৃশ্য আততায়ীর হাতে যুবক খুন। নাম নির্মল সেন। বয়েস ৩২।৩৩। মৃতের হাতে পাওয়া গেছে এক অদ্ভুত চিরকুট --তাতে লেখা আছে --"চপলের হত্যাকারী"।

এবার এই কাগজে কী লিখেছে দেখুন, 'অদৃশ্য খুনীর হাতে শহরের বুকে তৃতীয় খুন। সেই একই প্রক্রিয়ায়। এ যুবকের নাম নির্মল চ্যাটার্জি। মৃতের হাতে পাওয়া যায় সেই একই লেখা, "চপলের হত্যাকারী।"

সে কাগজটা রেখে নীল পরের কাগজটা তুলে নেয়। পড়তে শুরু করে, 'এ আমরা কোন রাজত্বে বাস করছি! শহরের বুকে আবার খুন। পুলিশ এবং শাসনব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এক খুনী আরো একটি খুনের নজির রেখেছে। এ যুবকের নাম নির্মল বসু। এরও হাতে পাওয়া যায় একই ধরনের পরোয়ানা, 'চপলের হত্যাকারী'। তারপর এটা দেখুন, এটায় তো মশাই সম্পাদকীয়তে আপনাদের একেবারে ইয়েতে বসিয়ে দিয়েছে। বলছে, কলকাতা শহরে পুনর্বার মগ-এর মুলুক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিরিজ অব মার্ডার। ধারাবাহিক খুনের পরম্পরা! অহো, কী আশ্চর্য, প্রতিটি নিহতের নাম নির্মল। ইনি নির্মল চৌধুরী। মস্ত ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র। এরা সকলেই এক অদ্বিতীয় চপলের হত্যাকারী। না জানি ইহার পর আরো কত নির্মলের বলিদান চলিবে। শহরের সকল নির্মলেরা, আপনারা সাবধান হউন, কেননা আপনাদের রক্ষাকর্তা, সেই নগররক্ষকেরা বর্তমানে শঙ্খনির্মিত বলয় হস্তে ধারণ করিয়া পাকগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব হে নির্মল যুবকেরা, আপনা জীবন বাঁচাইতে চাহিলে সাবধান হউন, নচেৎ এ শহর ত্যাগ করিয়া কোন দূর প্রবাসে স্থানান্তর গ্রহণ করুন।'

অতঃপর অস্থির বিকাশবাবু প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনি থামবেন মিস্টার ব্যানার্জি, কাটা ঘায়ে খামোকা নুন ছড়াচ্ছেন কেন?'

'আহা এগুলো তো আমাকে দেখাবার জন্যেই এনেছিলেন?'

'লাইফটা একেবারে হেল হয়ে গেল —এই নির্মল নামের ছেলেগুলোর জন্য!'

'তাই?'

'হ্যাঁ, তাই। কী দরকার আছে রে বাপু আঘাটায়-বেঘাটায় সন্ধ্যের পর যাবার যখন দেখছিস পটপট করে নির্মল খুন চলছে।'

'দারুণ বলেছেন। তা এগুলো আমায় দেখাতে এসেছেন কেন? আমার তো আগেই দেখা।'

বিকাশ প্রায় কঁকিয়ে উঠলেন, 'বড় গোয়েন্দা হয়েছেন, আপনার অনেক নাম —তা সে নামের প্রতি একটু সুবিচার করুন।'

নীল সামান্য হাসে। যদিও তার হাসিটা অক্ষমতাজনিত কারণে করুণ। তবু সে বলে, 'যেখানে আপনারাই কিছু করতে পারছেন না—সেখানে আমি তো চুনোপুঁটি।'

'উড়িয়ে দেবেন না মশাই, উড়িয়ে দেবেন না। আপনি পুলিশ নন তা জানি, কিন্তু পুলিশ আপনাকে বন্ধু মনে করে। অন্তত একটা নির্মলের ক্ষেত্রে পুলিশ আপনাকে বেসরকারীভাবে কিছুটা দায়িত্ব দিয়েছিল, আর অন্য একজন নির্মলের কাকা আপনাকে নিযুক্ত করেছিলেন, তার অ্যাডভান্সের টাকাও আপনি নিয়েছিলেন। ডিসক্রেডিট—আপনার, আমার, আমাদের সকলের। ছ'মাসে পাঁচটা খুন। লোকটা হয় পাগল, নয়ত আমাদের নাচাচ্ছে। আর হাতের টিপ দেখেছেন, প্রত্যেকটা ঠিক রগ টিপ করে ঝাড়ছে—ব্যাস, নির্মলেরা অক্কা পাচ্ছে—আর পুলিশকে ফুলিশ করে বাঁদর নাচাচ্ছে। ওপরওলা তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছে - চাকরি ছেড়ে দিয়ে বানপ্রস্থ নিতে।'

'তাহলে তাই করুন, এই কাগজের সম্পাদকীয়তে যা উপদেশ দিয়ে লিখেছে, প্রত্যেকটা কাগজে প্রথম পাতায় বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দিন, "শহরের সব নির্মলেরা —আর বাড়ি থেকে বেরোবেন না—বেরোলেই মারা পড়বেন"!'

'করুন, ঠাট্টা করুন, সবাই করছে— আপনিই বা বাদ যাবেন কেন?'

নীল সহসা একথার কোন উত্তর দিল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে জানলার ধারে চলে গেল। জানলার বাইরে ধোঁয়া উড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'ঠাট্টা আপনাকে করছি না। করছি নিজেকে। সত্যিই আমি অপদার্থ। পাঁচ পাঁচটা খুন। সব একই ভাবে। অথচ এতই চালাক সেই খুনী, যে সামান্য একটা সূত্র পর্যন্ত ফেলে যাচ্ছে না যাতে করে তাকে ট্রেস আউট করা যায়। তার টিকিটাকে পর্যন্ত চোখের আড়ালে রেখে আমাদের কলা দেখাচ্ছে। সব থেকে মুশকিল কী জানেন, ঘটনাগুলো সব ছড়ানো-ছিটনো। আজ নাকতলায়, কাল লেকটাউন। তারপর দেখা গেল লাশ পড়ে রয়েছে কাশীপুরে নয়ত বেলেঘাটায় পচা খালের ধারে। পুলিশের কুকুর···ছুটে যাচ্ছে বাস স্টপেজ পর্যন্ত · ব্যাস, তার দৌড় শেষ। এবার বোধহয় নীল ব্যানার্জিকে হেরেই ফিরে আসতে হবে।'

বিকাশ তালুকদার এবার সম্ভবত রেগেই গেলেন। প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'স্টপ, প্লীজ স্টপ, মিঃ ব্যানার্জি। এসব কথা আমার একেবারে শুনতে ভাল লাগছে না। আপনার মত লোক যদি বলে কেস সল্‌ভ্‌ করতে পারব না,

তাহলে তো হয়ে গেল।'

'ওসব বলবেন না। নীল ব্যানার্জিও মানুষ ভুল এবং অক্ষমতা তারও আছে।'

একথার সহসা কোন জবাব দিলেন না বিকাশবাবু। একটা সিগারেট ধরালেন। বেশ চিন্তিত মুখ। বোঝা যায় অনেক কিছু ভাবছেন, আবার দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। এক সময় বললেন, 'সব থেকে মিস্টিরিয়াস ব্যাপার দেখুন, সব কটা নির্মলের ক্ষেত্রে একটা জিনিস কমন্। প্রত্যেকের সঙ্গেই একটা না একটা মেয়ের সংযোগ। কেউ প্রেমিকা, আবার কেউবা গার্ল ফ্রেণ্ড। আর সেই সব রহস্যময়ী মেয়েরা খুনের পরই নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব কেউই প্রেমিকাদের কোন খোঁজই দিতে পারছে না। তাদের চেহারার যা বর্ণনা, সারা পশ্চিমবাংলায় ওরকম কয়েক লাখ মেয়ে আছে—'

'আপনার কী মনে হয়, সব নির্মলেরা তাদের প্রেমিকা বা গার্ল-ফ্রেণ্ডদের হাতে খুন হচ্ছে?'

'বলি কী করে? এক এক নির্মলের এক এক মেয়ে। কারো নাম সুমিত্রা কারো নাম প্রণতি, কারো নাম শিখা। ধ্যুৎ···। তার ওপর খুনের রকম দেখে তো মনে হয় না কোন মেয়ের পক্ষে ঐভাবে খুন করা সম্ভব। তাও যদি না হয়, তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় নির্মলদের খুন করছে ঐসব হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হওয়া মেয়েরা, তাহলে কী এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে এক চপলের হত্যার প্রতিশোধে এতগুলো মেয়ে প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। ধ্যুৎ···বড়ো অ্যাবসার্ড চিন্তা।'

হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। বিকাশ তালুকদার বললেন,

'দেখুন, বেল বাজছে, আবার কোন মক্কেল এল। কোন নতুন মক্কেল-টক্কেল এলে হটিয়ে দেবেন। এ নির্মল খুনের রহস্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আর কোন ডাইভারশন নয়।'

নীল মৃদু হেসে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলেই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সাদরে আহ্বান জানাল আগন্তুককে, 'আরে এসো এসো সুমিত এসো। কোথায় ছিল অ্যাদ্দিন? খুব কাজের চাপ তো!'

আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলল, 'হ্যাঁ দাদা, পর পর কয়েকটা ছবির কাজ নিয়ে ফেঁসে আছি।'

নীলের দেখিয়ে দেওয়া সোফায় এসে বসল সুমিত নামধারী বছর ছাব্বিশ-সাতাশের এক যুবক। চেহারাটি বেশ শিল্পীসুলভ। গালে হাল্কা দাড়ি। চুল অবিন্যস্ত। রঙচঙে হাতকাটা পাঞ্জাবি আর জিনসের প্যান্ট। কাঁধে ঝোলানো

সাইড ব্যাগ। দেখেই মনে হচ্ছিল ব্যাগটা বেশ ভারী। ব্যাগটা নামিয়ে যুবকটি বলল, 'দাদা, একটা দরকারে আপনার কাছে আসা।'

'শুনছি। তার আগে তোমার পরিচয়টা করিয়ে দিই। মিঃ তালুকদার, এ হল স্মিত বিশ্বাস। সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট। পরিভাষায় শব্দযন্ত্রী। ফিল্ম আর থিয়েটারে শব্দ নিয়ে প্রচুর এক্সপেরিমেণ্টাল কাজ করেছে। আর স্মিত, ইনি হচ্ছেন, মস্ত পুলিশ অফিসার, বিকাশ তালুকদার।'

'আঃ ব্যানার্জি, কী হচ্ছে কী?'

স্মিতও বিনয় প্রকাশ করল, 'দাদার স্বভাবই ঐরকম। প্রত্যেকের সামান্য গুণ নিয়ে উনি বেশ সোচ্চার। যেমন আমার সম্বন্ধে উনি যা বললেন, সব বাড়ানো কথা।'

'সে যাক, হঠাৎ তোমার বিশেষ কাজটা কী পড়ল? আমার লাইন আর তোমার লাইন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা।'

'যে কারণে এসেছি সেটা আপনার লাইনেই।'

'তাই নাকি? বেশ তাহলে বলে ফেল। বর্তমানে আমার যতই অবশেসান থাকুক, তোমার ব্যাপার শুনতে আমার কোন আপত্তি নেই। বল, প্রবলেমটা কী?'

'কিন্তু আপনাদের দুজনকে দেখে, মানে আপনারা কোন সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে—'

'আরে পুলিশ আর গোয়েন্দা—এরা সর্বদাই সিরিয়াস। বল, বল। তাছাড়া কুণ্ঠা বা লুকনো-চুকনোর কোন দরকার নেই। তালুকদার আমার বিশেষ বন্ধু এবং বিশ্বস্ত। ওঁর সামনে লুকোবার কিছু নেই। তুমি নির্দ্বিধায় বলতে পার।'

স্মিত একবার দুজনের দিকে তাকায়। পকেট থেকে চার্মসের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরায়, তারপর বলে, 'একটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে দাদা। আপনি তো জানেন স্টক শট-এর থেকেও কোন এফেক্ট মিউজিক আমি নিজে তৈরী করে নিতে বেশী আগ্রহী। যতটা পারি নেচারকে রিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করি। তো, দিন দুয়েক আগে একটা ব্যাপার ঘটেছে। নিস্তব্ধ রাতের একটা ন্যাচারাল সাউণ্ড এফেক্টের আমার দরকার পড়েছে। এদিক-ওদিক থেকে নিয়ে সিকোয়েন্সটার সাউণ্ড এফেক্ট হয়ত পাওয়া যেত। কিন্তু এবারে ভাবলুম, প্রকৃতি থেকে কিছু শব্দ কালেক্ট করি। তাই দিন দুয়েক আগে টেপটা চালিয়ে দিয়ে এসে ছিলাম জঙ্গলের মধ্যে।'

'জঙ্গল? জঙ্গল আবার পেলে কোত্থেকে?'

'আমার বাড়ির সামনে একটা জলা মতো জায়গা আছে। গাছ আর আগাছায় জায়গাটা প্রায় জঙ্গলের এফেক্ট এনেছে। তো ঘন্টাখানেক পর টেপটা বাড়িতে এনে শুনতে গিয়ে—'

সুমিত হঠাৎ থেমে যায়।

'কী আছে তোমার টেপে? শুনতে গিয়ে অ্যাবনরম্যাল কিছু পেয়েছ?'

'সঙ্গে এনেছি। শোনাবো বলে। তার আগে বাইরের ঐ জানালাটা বন্ধ করে দিন।'

নীল নিঃশব্দে জানালা বন্ধ করে এসে সামনে বসল। ইতিমধ্যে সুমিত ওর প্যানাসোনিক টেপটা বার করে টিপয়ের ওপর রাখল। তারপর একসময় চালিয়ে দিল টেপটা।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর কিছু কিছু শব্দ ভেসে আসতে লাগল। ঝিঁঝির ডাক, ব্যাঙের ডাক, গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার শনশন আওয়াজ। দূরে কোথাও কুকুর ডেকে উঠল। একটু পরেই শোনা গেল ট্রেন চলে যাবার শব্দ। তারপর প্রায় হঠাৎই একটি তীব্র আর্তনাদ। কোন ভারি কিছু পতনের ধপাস শব্দ। আর তারপরই বেশ কিছু দূর থেকে ভেসে আসে কান্নার শব্দ। অস্ফুট বিলাপের মধ্যে শোনা যায়, যদিও শব্দটা বেশ ক্ষীণ, কে যেন বলছে, 'পারলাম না চপল…এবারও পারলাম না।'

আবার নিস্তব্ধতা। তারপরই কার যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে দৌড়ে চলে যাবার আওয়াজ।

এই পর্যন্ত হবার পর সুমিত 'খট' শব্দে টেপ থামিয়ে দিল

'মরেছি রে!' বিকাশবাবুর খেদোক্তি।

'কী হলো বিকাশবাবু?'

সেকথার উত্তর না দিয়ে বিকাশ বললেন, 'এটা কবেকার ঘটনা?'

'গত পরশু।'

'রেকর্ডিং শোনার পর আর জঙ্গলে গিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনার ওখানে নির্মল নামে কেউ থাকে?'

সুমিত সহসা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে। তারপর একসময় বলে, 'সত্যি কথা বলতে কি, সেই জন্যেই আমার আসা। আমাদের ওখানে নির্মল গুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। বছর ত্রিশ বয়েস হবে। বেশ হ্যাণ্ডসাম চেহারা। পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। পরশু সন্ধ্যের পর থেকে আর তাঁকে

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাগজে প্রায়ই দেখছি নির্মল নামে পর পর কিছু যুবক খুন হয়েছে। টেপটা নিয়ে আমি এখানে আসতাম না—যদি না টেপের মধ্যে চপল নামের উদ্ধৃতি থাকত।

হঠাৎ নীল যেন নড়েচড়ে বসল। তারপর বেশ আহ্লাদিত মুখে বলল, 'তুমি একটা দারুণ কাজ করেছ সুমিত। বিকাশবাবু, আমি এই মুহূর্তে স্পট-এ যেতে চাই। যাবেন? ও বাই দ্য বাই, পুলিশে ইনফর্ম করা হয়েছে?'

সুমিত বলল, 'তা হয়েছে। তবে—'

বিকাশ যেন কথা কেড়ে নিলেন, 'তবে গিয়ে কোন লাভ নেই। আমার ধারণা নির্মল গুপ্তও আর বেঁচে নেই।'

নীল বলল, 'কিন্তু বডিটা তো থাকবে। সুমিত তোমার যেতে আপত্তি নেই তো?'

'তাহলে আর এলাম কেন? আমার দ্বারা যদি কোন কাজ হয়—করতে আপত্তি থাকবে কেন?'

'ক্যাসেটটা কদিনের জন্যে রাখা যাবে?'

'সিওর।'

'দেন গেট আপ। আর দেরি করা যাবে না।'

ওরা তিনজনেই উঠে পড়ে।

ঘন গাছগাছালি আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তিনজনে এগিয়ে চলেছে। যদিও এটা শহরের মধ্যে, তবুও এখনও পাড়াগাঁ ভাবটা কাটেনি। জায়গাটা গড়িয়া অঞ্চলের একটু ভেতর দিকে। যথেষ্ট পরিমাণে খাল ডোবা আর এলোমেলো গাছপালার ভীড়। তারই মধ্যে অবশ্য নতুন নতুন বাড়ি তৈরীর কাজ চলছে। সুমিতের বাড়িটা বেশ ভেতরের দিকেই। একটা ছোট্ট সাঁকো পেরিয়ে, ডোবার থেকে বড় একটা আধা-পুকুরের পাশ দিয়ে ওরা এসে পৌছল সুমিতদের বাড়িতে। পুরনো দিনের কেনা জমি। এখন যদিও এদিকে কাঠার দাম আকাশছোঁয়া। সুমিতের বাবা অন্তত বছর ত্রিশ আগে প্রায় বিঘেখানেক জমি কিনে রেখেছিলেন। একটা দোতলা বাড়িও তৈরী করেছিলেন। বাড়িটা অবশ্য ছোটখাটো। বাকি অংশটায় ফল ও ফুলের গাছ। যত্নের অভাবে এখন জঙ্গল।

নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে স্থমিত জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, একবার বাড়িতে ঢুকবেন তো ?'

'এখন থাক স্থমিত। আগে আসল কাজটা হোক। তাছাড়া বাড়িতে তোমার অতিথি আপ্যায়নের জন্যে তো কেউ নেই।'

'হ্যাঁ, তাও বটে। ছোটবেলায় বাবা-মা গেছেন। ছিলেন এক বুড়ী মাসী। তাও বছরখানেক হল—।'

নীল হাসতে হাসতে বলল, 'এবার একটা বিয়েথা কর। নইলে বাড়িটাই দেখবে একদিন গাছপালায় খেয়ে নিয়েছে।'

স্থমিত কিছু না বলে মাথা নিচু করে এগিয়ে চলল বাড়িটাকে বাঁদিকে রেখে। চলতে চলতেই বিকাশবাবু বললেন, 'টেপটা আপনি কোথায় রেখেছিলেন ?'

'আমরা সেইদিকেই যাচ্ছি। ঐ যে দেখছেন দূরে আম-কাঁঠালের ঘন জঙ্গল, সেখানেই একটা গাছের নিচে।'

'সাপটাপ আছে নাকি ?'

'চোখে দেখিনি। তবে থাকতেও পারে। যা জঙ্গল !'

এলোমেলো ডালপালা সরাতে সরাতে আর উঁচুনিচু মাঠের সমতা মেপে এগোতে এগোতে নীল জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা স্থমিত, তোমার টেপে যে আর্তনাদটা শোনা গেল সেটা নিঃসঙ্কোচে একটা পুরুষকণ্ঠ ! কিন্তু একটা অস্পষ্ট কণ্ঠও সেই সঙ্গে ভেসে এসেছে, যদিও ট্রেনের আওয়াজে প্রায় চাপা পড়ে গেছে। কণ্ঠস্বরটা কার হতে পারে ? পুরুষ না নারী ?'

'বোঝার চেষ্টা আমিও করেছি। ঐ জায়গাটা আমি অনেকবার বাজিয়েছি। কিন্তু ধরতে পারিনি। একবার মনে হয়েছে ছেলের গলা, আবার মনে হয়েছে কোন মহিলাকণ্ঠ। কিন্তু এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে, রাত্রিবেলা এর চেহারাটাই পাল্টে যায়—চেনা লোকও বিশেষ প্রয়োজন না হলে আসে না—একজন মহিলার পক্ষে কি আসা সম্ভব ?'

হঠাৎ বিকাশবাবু বললেন, 'না হবার কি আছে ? আশপাশের কোন মেয়ে হলে আসতে পারে বৈকি। তার পক্ষে তো জায়গাটা চেনাই।'

স্থমিত সামান্য দ্বিধা নিয়ে বলল, 'আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেরকম ডাকাবুকো মেয়ে —'

'আরে মশাই, গভীর জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে একটি ছেলেমেয়ে কখন আসে ? প্রেম, প্রেম—প্রেমে পড়লে বুকের সাহস অনেক বেড়ে যায়।'

এ কথায় কেউ কোন মন্তব্য করল না। আরো খানিকটা এগোতে ওরা একটা

জলার ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সুমিতই এগিয়ে গিয়ে একটা বড়সড় আমগাছের নিচে গিয়ে বলল, 'ঠিক এই জায়গাটায় আমি টেপটা রেখে গিয়েছিলাম।'

জায়গাটা ভালো করে দেখতে দেখতে নীল জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার টেপের মাইক্রোফোন সেনসিভিটি কী রকম?'

'শুনলেন না, ট্রেনের আওয়াজ পর্যন্ত কী রকম স্পষ্ট এসেছে। এখান থেকে ট্রেন লাইন বেশ খানিকটা দূরে। তারপর চলে যাওয়ার আওয়াজটা পর্যন্ত এসে গেছে। জাপানী জিনিস তো!'

আর কোন কথা হল না। বিকাশবাবু মাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে একদিকে এগিয়ে গেলেন। নীল গেল অন্যদিকে। সুমিত নীলকে অনুসরণ করতে লাগল। সেই মুহূর্তে ওর মধ্যেও একটা গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাব এসে গিয়েছিল। যা দেখার তাও দেখছিল, যা দেখার নয় তাও মনোযোগ দিয়ে দেখে যাচ্ছিল।

নীল ওর থেকে সামান্য এগিয়ে ছিল। হঠাৎ ও প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা তোমাদের এই নির্মল গুপ্ত থাকত কোথায়?'

'এই যে এখন আমরা যে জায়গাটা ধরে চলেছি, এটা পেরোলেই একটা পাচ-ছ ফুটের মত ইটের রাস্তা পাবেন। রাস্তার ওপাশেই ওদের বাড়ি।'

'তোমার সঙ্গে চেনা-পরিচয় কেমন ছিল?'

'না, তেমন কিছু নয়। ভদ্রলোককে চিনতাম, মানে মুখ চিনতাম। আসলে ওনার আর আমার বাড়ির মাঝে এই 'নোম্যান্‌স্' জঙ্গল থাকায় তেমন পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। যাতায়াতও হ'ত সম্পূর্ণ আলাদা রাস্তায়। আমাকে বাস ধরতে যেদিক দিয়ে আমরা এলাম ঐ পথেই যেতে হবে। আর নির্মলবাবুকে যেতে হবে ঐ কাঁচা ইটের রাস্তা ধরে। তাছাড়া আমি তো কাজেকর্মে কতটুকুই বা বাড়িতে থাকি। আরে · এটা কী?'

বলেই ও হঠাৎ নিচু হয়ে ঝোপের ধারে পড়ে থাকা একটা আধা-চকচকে কিছু তুলে নিল। তারপর সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে নীলকে ডাকল, 'দাদা, একবার এটা দেখুন তো! আশ্চর্য, এটা এখানে এল কীভাবে?'

ওর ডাকে নীল দাঁড়িয়ে পড়ল। সুমিত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা নীলের হাতে তুলে দিল। একটা কাচের পেপারওয়েট। সবুজের মধ্যে লালের ফোয়ারা। মাঝারি আকারের পেয়ারার সাইজ। জায়গায় জায়গায় কাদা লেগে – । পেপারওয়েটটা দেখতে দেখতে নীল বলল, 'এখানে নিশ্চয় লোকজনের ত আছে, তাই না সুমিত?'

'তা হয়ত আছে। কিন্তু পেপারওয়েট নিয়ে এখানে মানে এই জঙ্গলে কী করতে আসবে ?'

'আসতেও পারে। ওটা ছুঁড়ে হয়ত গাছের আম-পেয়ারা পাড়ার চেষ্টা করেছিল।'

'আম-পেয়ারা পাড়তে পেপারওয়েট ? বাঁশের লগি কিংবা ভাঙা খোয়া বা ইটের টুকরো দিয়েই তো আম-টাম পাড়া যায়।'

'মানুষের কত বিচিত্র খামখেয়ালীপনা থাকে! কেউ হয়ত হাতের কাছে পেয়ে গিয়েছিল ওটা।'

নীলের যুক্তি, ঠিক মন থেকে সায় দিতে পারল না সুমিত। তবে তর্কও করল না। ওরা আরো খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ বিকাশবাবুর চিৎকারে উভয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। দূরে একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে বিকাশবাবু হাত পা ছুঁড়ে ডাকছিলেন, 'ব্যানার্জি, মিঃ ব্যানার্জি, তাড়াতাড়ি আসুন। পেয়েছি —পেয়েছি।'

দ্রুতপায়ে ওরা এগিয়ে গেল। সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। দিন হলেও জায়গাটা ছিল প্রায় ছায়াচ্ছন্ন। তবুও বুঝতে অসুবিধা হয় না। এবারে মৃতদেহ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। দু হাত দু দিকে ছড়ানো। পরনে পাজমা আর শার্ট। একদিকের রগে জমাট রক্ত। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। একটা পা থেকে খুলে গেছে, অন্যটা তখনও পায়ে আটকানো। এক হাত মুষ্টিবদ্ধ। মুঠির মধ্যে পাকানো কাগজ।

সুমিতের দিকে তাকিয়ে নীল বলল, 'চিনতে পারছ সুমিত ?'

সুমিত শিল্পী মানুষ। খুব সম্ভবত এ ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুটৃত্যু ও এর আগে দেখেনি। মুখটা অন্ধকারে ফিরিয়ে নিয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ, নির্মল গুপ্ত।'

বিকাশ বললেন, 'তার মানে ছ নম্বর নির্মল।' বলেই পাকানো কাগজটা টেনে নিয়ে পড়লেন। এগিয়ে দিলেন নীলের হাতে। কী লেখা থাকবে তা ও জানত। তবু খুলল। সেই একই লেখা। 'চপলের হত্যাকারী'।

'আর কটা নির্মল মরবে বলুন তো একজন চপলের জন্যে ?' বিকাশবাবুর খেদোক্তি।

'যতক্ষণ না সেই খুনের নায়ককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।'

'এ তো মশাই ভেল্কি দেখাচ্ছে। রীতিমত পুলিশকে চ্যালেঞ্জ! শহরের বুকে বসে অবাধে হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে।'

হঠাৎ নীল বলে উঠল, 'মিঃ তালুকদার, এখন তো আপনাকে নির্মল গুপ্তর বাড়ি

যেতে হবে। আপনি যান। আমি এগোচ্ছি।'

'এগোচ্ছি মানে?'

'পুলিশি ব্যাপারট্যাপারগুলো আপনিই করুন। আমি একটু অন্য কাজে যাব।'

'অন্য কাজ মানে?'

'আছে, বিশেষ কিছু কাজ আছে।'

'নির্মলবাবুর বাড়ি কিন্তু গেলে ভালো করতেন।'

'কী আর নতুন কথা জানব? একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ও হ্যাঁ, ঐ চিরকুটটা দিন তো। কাগজটা একটু নেড়েচেড়ে দেখতে হবে। সুমিত, তোমাকে ভাই আর একটু কষ্ট করতে হবে। তুমি কিছুক্ষণ তালুকদার সাহেবের সঙ্গে থাক। হয়ত ওঁর কিছু দরকার-টরকার পড়তে পারে। আমি চললুম।'

কাগজের টুকরো আর পেপারওয়েটটা নিয়ে নীল হনহন করে বনবাদাড় পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় বোকার মত তালুকদার আর সুমিত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় গিয়ে বসল নীল। সামনের ছোট কাচের টপ দেওয়া টেবিলের ওপর রাখা আছে দুটো জিনিস। একটা পেপারওয়েট আর একটা চিরকুট যেখানে লেখা আছে 'চপলের হত্যাকারী'। সিগারেট টানতে টানতে গভীর মনোযোগ দিয়ে ও একবার পেপারওয়েটটা দেখছিল। হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে সেটার ওজন মাপছিল। তারপর সেটা রেখে দিয়ে চিরকুটটার লেখায় গভীর মনোনিবেশ করছিল। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা টেবিলেই ছিল। সেটাও কয়েকবার লেখাটার ওপর ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। তারপর একসময় 'নাঃ, সব ধোঁয়া' বলে দুটোই সরিয়ে রেখে মাথা এলিয়ে দিল সোফায়। ভরপেট খাবার পর আরামদায়ক সোফায় শুয়ে সিগারেট টানলে একটা ঘুম-ঘুম ভাব আসেই। নীলের চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু পারতপক্ষে ও দুপুরে কখনো ঘুমোয় না। দুপুরে ঘুম মানেই রাতের ঘুম শেষ। সারা বিকেল এবং সন্ধ্যে শরীর ম্যাজম্যাজ। গাঝাড়া দিয়ে ও বইয়ের আলমারির কাছে গেল। হয় প্রবন্ধ নয় গল্পকবিতা,

এরকম ভারি একটা কিছু না পড়লে ঘুমিয়ে পড়তেই হবে। দিন কয়েক আগে বইমেলা থেকে কিছু কবিতার বই কিনেছিল। সেগুলো তখনো র‍্যাকে তোলা হয়নি। বইগুলো একটা একটা করে তুলে দু'এক পাতা দেখে আবার পরের বইটা টেনে নিচ্ছিল। কোনটাই মনঃপূত হচ্ছিল না। ফিরে আসছিল সোফার কাছে, হঠাৎ কী যেন বিদ্যুৎচমকের মত মাথায় ফ্ল্যাশ দিল। 'আশ্চর্য!' বলেই ছুটে গেল কবিতার বইগুলোর দিকে। একটা একটা করে সরিয়ে তুলে আনল একটা বই। নিজের মনেই বিড়বিড় করল, 'আশ্চর্য, আশ্চর্য, ভারি আশ্চর্য!'

সামান্য একটা কবিতার বই। বইটার নাম 'চরণচিহ্ন'। প্রচ্ছদটা করা হয়েছে 'চরণচিহ্ন' স্ক্রীপ্ট লেটারিং দিয়ে। কবির নাম নির্মল সান্যাল। অখ্যাত এক কবির লেখা 'চরণচিহ্ন' যে তার বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মনে আশার আলো জাগিয়ে তুলবে ভাবতেই পারেনি নীল। বইটা নিয়ে ফিরে এল সোফায়। জুত করে আরো একটা সিগারেট ধরিয়ে সামনে মেলে ধরল দুটো লেখা। 'চরণচিহ্ন' আর 'চপলের হত্যাকারী'র চিরকুটটা। তিনটে 'চ' যেন একই লোকের লেখা। স্টাইল অব লেটারিংএ কোন পার্থক্য নেই। কেবল একটি লেখা ছোট, অন্যটি যেন ব্লো-আপ করা হয়েছে। নিজের সিদ্ধান্ত নিখুঁত করার জন্যে তুলে নিল ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা। তিনটি 'চ' এর এক ছাঁদ, এক ছন্দ। আর সব থেকে ভয়াবহ যা তা হল কবির নাম। নির্মল সান্যাল। তবে কী অখ্যাত এই কবিও চপলের হত্যাকারী হিসেবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে?

ত্বরিতে ও পাতা উল্টিয়ে টাইটেল পেজে চলে গেল। প্রচ্ছদশিল্পী অনু রায়।

কে এই অনু রায়? তার লেখা 'চ' অক্ষরটির সঙ্গে চপলের হত্যাকারীর 'চ'-এ এত মিল কেন? বইটির প্রকাশক দাস পাবলিশিং। দাস পাবলিশিং-এর ঠিকানা আর ফোন নম্বর বইয়েতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও ডায়াল করল দাস পাবলিশিং-এ।

সৌভাগ্যই বলতে হবে। সাধারণত এটা হয় না। মাত্র তিনবারেই ফোনে যোগাযোগ হয়ে গেল।

'এটা কি দাস পাবলিশিং?'

ওপাশ থেকে খুব সম্ভবত দাসমশাই-ই ফোন তুলেছিলেন। নীলের প্রশ্নে দাসমশাই জানালেন 'চরণচিহ্ন' ওনারাই প্রকাশ করেছেন।

'ওই বইয়ের ব্যাপারে আমি একটু ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাই···না না, ফোনে সম্ভব নয়। আমি এখুনি আসছি।'

দাসমশাই হয়ত কিছু বলতে চেয়েছিলেন। বলার সুযোগ না দিয়ে নীল লাইনটা কেটে দিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নীল কলেজ স্ট্রীট পৌছে গেল। দাস পাবলিশিং বেশ বড় কনসার্ন। বিশাল কাউণ্টার। মেলা খদ্দের। ছুটির দিন নয়। কর্মচারীরা প্রত্যেকেই ব্যস্ত। তবু তারই মধ্যে একজনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করল, 'দাস মশাই কোথায় বসেন?'

ছেলেটি এক লট অর্ডারি বইয়ের মেল প্যাকিং করছিল। নীলের দিকে না তাকিয়ে সামনের কাচের দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

কাচের দরজা ঠেলতেই বোঝা গেল ঘরটায় ভ্যাপসানি গরম। চারদিকে বইয়ের গাদা। ঠিক মাঝখানে একটা মাঝারি টেবিল। টেবিলে গাদা প্রুফের রোল করা বাণ্ডিল। টেবিলের ওপাশে বছর পঞ্চাশেক এক কালোকুলো হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক একান্ত মনোযোগ দিয়ে বোধহয় প্রুফ দেখছিলেন আর দর দর করে ঘামছিলেন।

দরজা ঠেলে নীল জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি?'

ভদ্রলোকের চোখে ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি রিডিং গ্লাস। চশমার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে সরাসরি নীলের দিকে ফেলে বললেন, 'এসেই তো পড়েছেন। এবার বসে পড়ুন।'

নীল মনে মনে বলল, 'কেঠেল মনে হচ্ছে।'

ও অবশ্য হেসে হেসেই বলল, 'বসতে না বললেও বসতাম। একটা বিশেষ দরকারে—'

বাধা দিয়ে দাসমশাই বললেন, 'ঘণ্টাখানেক আগে আপনিই ফোন করেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তারপর পকেট থেকে নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিল। অর্ধচন্দ্রাকৃতির মধ্যে দিয়ে কার্ডটি পড়ে ফেরত দিতে দিতে বলল, 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? গোয়েন্দা? হ্যাঁ গোয়েন্দাকাহিনী আমি ছাপি। তবে জলজ্যান্ত গোয়েন্দার সঙ্গে পাবলিশারের কী সম্পর্ক?'

'একটা ইনফরমেশনের জন্যে একটু বিরক্ত করব।'

ভদ্রলোক আবার চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন, তারপর পান চিবনোর ভঙ্গীতে বললেন, 'কী রকম?'

'চরণচিহ্ন' নামে একটা কবিতার বই আপনার এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।'

'তাতে অসুবিধার কী হল ?'

'কিছু না। তবে কভার ডিজাইনারের নাম দেখলাম অনু রায়।'

'তা উনি যখন ডিজাইনটা করেছেন, ওঁর নাম যাওয়াই তো স্বাভাবিক। আপনার আপত্তি আছে ?'

'না, বিন্দুবিসর্গ নয়। তবে ভদ্রলোকের ঠিকানাটা চাইছিলাম।'

'গোয়েন্দাদেরও ডিজাইন দরকার হয় ?'

নীল মৃদু হেসে জানাল, 'মাঝে মাঝে গোয়েন্দাদের সব কিছুই দরকার হয়।'

'পাওয়া যাবে না।'

'তার মানে ? ডিজাইনারের ঠিকানা আপনার কাছে থাকে না ?'

'হ্যাঁ, থাকে। তবে অনু রায়ের ঠিকানা আমার কাছে নেই।'

'কেন ?'

'উনি আমাদের নিয়মিত শিল্পী নন--তাই।'

'মানেটা বুঝলাম না।'

'আমাদের এখানে যাঁরা রেগুলার ছবি আঁকেন, তাঁদের ঠিকানা আমাদের কাছে আছে। তবে মাঝে মাঝে লেখকের ইচ্ছানুসারে বাইরের কিছু শিল্পী দিয়ে আমাদের আঁকাতে হয়। এক্ষেত্রে নির্মল সান্যাল, মানে কবি নির্মল সান্যাল তাঁর ঐ বইটার জন্যে অনু রায়ের নাম প্রস্তাব করেন। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। ভালো ডিজাইন হলে যে কোন শিল্পীর ছবি নিতে আমাদের আপত্তি নেই। অনু রায়ের আঁকা কভারটা নিয়ে এসে নির্মলবাবু আমাদের সামনে ফেলে দিলেন। পছন্দ হয়ে গেল। নিয়ে নিলুম। পেমেন্টটাও নির্মলবাবুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে একান্তই যদি অনু রায়কে আপনার দরকার হয়—নির্মলবাবুর কাছে চলে যান। দিলে উনিই ওনার ঠিকানা দিতে পারবেন।'

'তা নির্মলবাবুর ঠিকানা নিশ্চয় পাওয়া যাবে ?'

এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে দাসমশাই বেল টিপলেন। একটু পরেই একটা ছোকরা এসে দরজা ঠেলে দাঁড়ালো।

'গোপাল, মুখার্জীর কাছে এঁকে নিয়ে যাও। নির্মল সান্যালের ঠিকানা এঁর দরকার।' আর কিছু না বলে ভদ্রলোক আবার প্রুফের গাদায় মুখ নামালেন। নীল প্রতিনমস্কারের সুযোগ পেলো না। অগত্যা বাধ্য হয়েই সে গোপাল নামের ছেলেটিকে অনুসরণ করল।

সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে ঝকমকে দোতলা বাড়ি নির্মল সান্যালের। নেমপ্লেটে অবশ্য নাম লেখা আছে—বিমল সান্যাল। খুব সম্ভবত নির্মলবাবুর বাবা অথবা ঠাকুর্দা হবেন। দরজা বন্ধ ছিল। দরজার পাশে বেলের নবও ছিল। বেলের নব টিপতেই একমাথা ঝাঁকড়া চুল ছিপছিপে বছর ২৮/২৯-এর এক যুবক এসে দাঁড়াল। চোখে কালো সরু ফ্রেমের চশমা। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। নীলকে দেখে অপরিচিতের কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চান?'

'নির্মল সান্যালকে।'

'আমিই নির্মল সান্যাল। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না। কোত্থেকে আসছেন?'

নীল বৃথা বাক্যব্যয় না করে নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিল। কার্ডটা পড়ে নির্মলের মুখে ফুটে উঠল সামান্য বিরক্তি। তারপর বিরক্তি নিয়েই বলল, 'কিন্তু—'

মৃদু হেসে নীল বলল, 'চিন্তার কিছু নেই, কয়েকটা ইনফরমেশনের জন্যে একটু বিরক্ত করব।'

'ইনফরমেশন? কিন্তু আমাকে যে এখুনি বেরুতে হবে।'

নীল কিন্তু নির্মলকে কোন রকম পাত্তাই দিল না। খানিকটা অ্যাগ্রেসিভ মুডে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় বেরুবেন। কিন্তু এটা অনেক জরুরী। চলুন, মিনিট দশেকের বেশী সময় নেব না। নিশ্চয় বসার ঘর আছে বাড়িতে?'

'তা আছে, বেশ আসুন।'

নীলকে সঙ্গে নিয়ে নির্মল সান্যাল বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে গেল। বেশ সাজানোগোছানো সুন্দর ঘর।

'বাঃ, বেশ সুন্দর ঘর তো। একটু বসা যাক, কেমন?'

'পুলিশের লোক বলে কী আপনি জুলুম করতে চাইছেন?'

'আমি তো পুলিশের লোক নই।'

'পুলিশের লোক হোন বা না হোন, আপনার সঙ্গে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। আমার অনেক জরুরী কাজ রয়েছে।'

'অস্বীকার করছি না। তবে আমার সব কথা শুনলে আপনার মনে হবে আমার বক্তব্যই আপনার কাছে অনেক বেশী জরুরী। এখানে আপনার নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত।'

অবাক হল নির্মল, বলল, 'আমার নিরাপত্তা—মানে ?'

'নিশ্চয় খবরের কাগজ পড়েন। গত সাত আট মাস ধরে মাঝে মাঝেই এই শহরে নির্মল নামধারী কিছু যুবক খুন হচ্ছেন—'

নির্মলের মুখে ভাবান্তর দেখা যায়। তাকে খানিকটা বিচলিতও মনে হয়। সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সে বলে 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন—'

'আপনি উত্তেজিত না হয়ে আগে বসুন।'

ধপ্ করে নির্মল বসে পড়ে চেয়ারের ওপর। তারপর বলে, 'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কী মনে করেন আমার জীবনও—'

"চরণচিহ্ন" বইয়ের কবি তো আপনিই ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনার বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন জনৈক শিল্পী। অনু রায়। তাঁকে আপনি চেনেন ?'

'চিনি। কিন্তু…'

'অনু রায়ের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ?'

'পরিচয়…মানে প্রায় সাত-আট মাস হবে।'

'অনু রায়ের ঠিকানা নিশ্চয় আপনার কাছে আছে ?'

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু নির্মল হত্যার সঙ্গে অনু রায়ের ঠিকানার কী সম্বন্ধ বুঝতে পারছি না।'

'কিছু মনে করবেন না নির্মলবাবু। শহরের বুকে পর পর এতগুলো নির্মল নামের যুবক খুন হওয়ার জন্য পুলিশ বড় সজাগ হয়ে উঠেছে। সম্ভাব্য সব ব্যাপারেই তাদের বেশীমাত্রায় সাবধানতা নিতে হচ্ছে। আচ্ছা, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব। আপনার কোন বান্ধবী আছেন ?'

'দেখুন মিঃ ব্যানার্জি, আমাকে সাবধান করানোর জন্যে আপনাকে নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাবো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার সব ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনাকে জানাতে হবে।'

'বুঝলাম, বলতে চান না। যাই হোক, আপাতত আমাকে অনু রায়ের ঠিকানাটা দিন। তারপর যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আমার ঠিকানায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এতে আপনার ভালোই হবে।'

নির্মল আর কিছু না বলে নিজের ডায়েরী থেকে অনু রায়ের ঠিকানাটা লিখে এনে দিল। নীল নমস্কার জানিয়ে উঠে বসল। যাবার মুখে আরো একবার নির্মলকে সাবধানে থাকার উপদেশ দিয়ে ও বেরিয়ে এল।

বেশ কয়েকদিন যাবৎ গুমোট গরম চলছিল। বিকেলের মুখেই বৃষ্টি নামল। আর বৃষ্টিটা নামল, নীল যখন বাস থেকে নামার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। স্টপেজ এসে গিয়েছিল। বাধ্য হয়েই নামতে হল। শেডটেড দেখে মাথা বাঁচাতে বাঁচাতেই বেশ খানিকটা ভিজে গেল। প্রায় মিনিট পনের অপেক্ষা করার পর বৃষ্টির দাপট কমে এল। ওদিকে ততক্ষণে সন্ধ্যের ছায়াও ধীরে ধীরে নেমে আসছে। নির্মল সান্যালের দেওয়া নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে নীল যখন ঠিক দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন প্রায় পৌনে ছটা। অতি সাধারণ একতলা বাড়ি। দোতলার কাঠামো আছে। কিন্তু ঘরটর কিছু নেই। কোন কলিং বেল ছিল না। অগত্যা কড়া নাড়তে হল।

প্রায় মিনিটখানেক পর বেরিয়ে এলেন এক বর্ষীয়সী মহিলা। বছর পঞ্চাশ তো হবেই। তবে মুখে বয়েসের ছাপ পড়েছে একটু বেশী। দেখেই কেমন যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়। মনে হয় জীবনে তিনি ক্লান্ত। বিষণ্ণতার ভারী ছায়া চোখেমুখে। ভাঙা ভাঙা গলায় মহিলা প্রশ্ন করলেন, 'কাকে চান?'

'অনু রায় কী এ বাড়িতে থাকেন?'

'হ্যাঁ থাকেন, কিন্তু এখন নেই। আপনি আসছেন কোত্থেকে?'

'আসছি কলকাতা থেকে। আসলে একটা ডিজাইনের ব্যাপারে—আচ্ছা উনি কখন ফিরবেন বলে মনে হয়?'

'ঠিক বলতে পারব না। ওর ফেরার কোন ঠিক নেই।'

'ভারী মুশকিলে পড়লাম···উনি বলেছিলেন সন্ধ্যের মুখেই ফিরে আসবেন।'

'তাহলে একটু অপেক্ষা করুন—এসেও যেতে পারে।'

ভদ্রমহিলা দরজা ছেড়ে ভিতরে চলে গেলেন। নীলও পিছন পিছন ঘরে গিয়ে ঢুকল। বেশ বড়সড় পরিপূর্ণ আর্টিস্টের ঘর। সারা ঘরে নানা ধরনের ছবি বাঁধানো রয়েছে। কোনটা হাতে আঁকা, কোনটা ছবির প্রিন্ট। একদিকে একটা আলমারি। বেশ কিছু বইও আছে। অধিকাংশই আর্টের ওপর। ঘরের অন্যদিকে একটা বড় মাপের টেবিল। টেবিলে রং তুলি সেট স্কোয়ার স্কেল। নানা ধরনের কমার্শিয়াল আর্টের জিনিসপত্র। কিন্তু সবই অগোছালো, এলোমেলো। ঘরের ঠিক মধ্যিখানে প্রায় চারফুট উঁচু একটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য। চারচৌকো একটা

ছোট টুলের উপর রাখা। বিচিত্র এক ভঙ্গিমায় এক পুরুষ মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। একটা জীবন্ত মনিপ্ল্যাণ্ট মূর্তির গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মনিপ্ল্যাণ্টটা বেশ সতেজ। নীল খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মূর্তিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বসছি।'

টেবিলে এপাশে খানকয়েক ছোট ছোট চেয়ার ছিল। তারই একটা টেনে বসতে বসতে বলল, 'আপনি—?'

'ওর মা।'

নীল হাত তুলে নমস্কার জানায়। ভদ্রমহিলা প্রতি নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অনেকটা দূর থেকে এসেছেন। ভিজেওছেন। নিশ্চয় চা চলবে?'

'না, একটু আগেই চা খেয়েছি। আপনার ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমি ততক্ষণে একটু ম্যাগাজিনগুলো দেখি।'

আর কিছু না বলে মহিলা ভিতরে চলে যান। নীল সিগারেট ধরিয়ে একটা ম্যাগাজিন টেনে নেয়। ঠিক ম্যাগাজিন নয় 'গ্রাফিক্স-এর একটা ভালুম। বিজ্ঞাপনের পত্রিকা। কিন্তু বিজ্ঞাপনে তার তখন কোন আকর্ষণ নেই। আগাপাশতলা সে ঘর এবং ঘরের মধ্যে অবস্থিত বস্তুগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। কয়েকটি জিনিস তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। প্রথমটি হল সেই ভাস্কর্যটি। কোন্ ভাস্করের করা তা বলা সম্ভব নয়। তবে কারুকর্ম হিসেবে যে এটি উৎকর্যতার নিদর্শন তা নীল অস্বীকার করতে পারল না। কিন্তু নিকষ কালো মূর্তির মাথা থেকে বুক পর্যন্ত অজস্র দাগ। মনে হয় যেন ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। কিসের আঘাত তা বোঝা যায় না। কিন্তু দাগগুলো বেশ প্রকট। এত সুন্দর করে রাখা সুন্দর এক শিল্পকর্মে এত নির্দয় আঘাত কেন···নীল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মূর্তি ছেড়ে ধীরে ধীরে সে কাজের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অমু রায়ের বসার পিছনের র‍্যাকে একটি অর্ধ-নিঃশেষিত মদের বোতল। হুইস্কি। 'স্বভয় ক্লাব' ব্র্যাণ্ড। টেবিলের ওপর বেশ কয়েক প্যাকেট একটু বেশী দামের সিগারেটের প্যাকেট। অ্যাশট্রের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে পোড়া সিগারেটের টুকরো।

হঠাৎ ওর কী খেয়াল হয়। উঠে যায় বইয়ের র‍্যাকের কাছে। বাংলা ইংরাজী বইয়ের সঙ্গে প্রচুর বিদেশী ডিজাইনের বই। সব বইই বেশ দামী। বইগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ নিচের র‍্যাকে একটি বইয়ের অবস্থান ওকে বিশেষ

মনোযোগী করে তোলে। অন্যান্য বই অপেক্ষা ঐ বিশেষ বইটি খানিকটা যেন সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। কী মনে হওয়ায় হঠাৎ ও বইটি টেনে বার করে। বই বার করার সঙ্গে সঙ্গে একটি আপাতঅদ্ভুত বস্তু বেরিয়ে আসে। অদ্ভুত এই কারণে, একজন আর্টিস্টের ব্যক্তিগত দামী বইয়ের র‍্যাকে বস্তুটির থাকার কথা নয়। দীর্ঘাকার নাইলন মোজা। বডি কালার। সাধারণত মেয়েরাই এই ধরনের মোজা ব্যবহার করে। মোজাটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে আরো একটি জিনিস ওর নজরে পড়ে। মোজার পাতার সামনের অংশটি ছেঁড়া। ঝটিতি সে দরজার দিকে তাকায়। এবং আরো দ্রুত তৎপরতায় সেটি সে পকেটস্থ করে। তারপর যায় ড্রইং-টেবিলের কাছে। কয়েকটি অর্ধসমাপ্ত ডিজাইন এলোমেলো পড়ে আছে। বেশীর ভাগই বিজ্ঞাপনের লেআউট। হঠাৎ ওর নজরে আসে টেবিল সংলগ্ন ড্রয়ারটি খোলা। নীলের তখন ভাবা বা ধরাপড়া ইত্যাদি চিন্তাগুলো মাথা থেকে উবে গেছে। ড্রয়ারটি ধরে সে টান দেয়। এলোমেলো প্রচুর হাবিজাবি কাগজ ঠাসা। কাগজগুলো সরাতেই চোখে পড়ে একটি লাল ডায়েরি। ডায়েরি খুলতেই বেরিয়ে আসে একটি ছবি। কালার্ড পোস্টকার্ড সাইজ ছবি। ছবিটি দেখতে দেখতে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর ঘাড় নাড়তে নাড়তে পুনরায় ছবিটি ডায়েরির মধ্যে ঢোকাতে যাবে, কিন্তু হঠাৎই সেটা হাত ফস্কে মাটিতে পড়ে যায়। ছবিটি পড়েছিল উপুড় হয়ে। তুলতে গিয়েই ও থমকে যায়। ছবির পিছনের সাদা অংশে কী যেন লেখা রয়েছে। ঝটিতি ছবিখানি তুলে নিয়ে লেখা অংশে চোখ বোলাতেই ওর মুখে যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগল। তারপর অত্যন্ত নির্লিপ্তের মতো ছবিটি নিজের সাইডব্যাগে চালান করে দিল। ড্রয়ার বন্ধ করে ফিরেই আসছিল, হঠাৎ কী মনে হতে আবার ড্রয়ার খুলে লাল ডায়েরিটাও পকেটস্থ করে ড্রয়ার বন্ধ করতে যাবে, এমন সময়ে একটি কণ্ঠস্বরে ও সম্বিৎ ফিরে পায়। অনু রায়ের মা কখন যেন ফিরে এসেছেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'সত্যিই কী আপনি কোন ডিজাইন করাতে এসেছেন?'

নীল মুখ তুলে মহিলাকে দেখল। তার মুখে অবশ্য ধরা পড়ায় কোন সঙ্কোচ নেই। বেশ ধীরে ধীরেই সে ড্রয়ার বন্ধ করে।

'কারো বাড়ি এসে তার অসাক্ষাতে তারই জিনিসপত্র ঘাঁটা কী ভদ্রলোকের কাজ বলে মনে করেন?'

'আজ্ঞে না, তা মনে করি না। এটা মহাবিদ্যার পর্যায়ে পড়ে। আসলে বসে থাকতে থাকতে খুব বোর ফিল করছিলাম।'

'তাই অন্যের ড্রয়ার ঘাঁটতে হবে? দেখে তো 'চোর' বলে মনে হয় না। মতলবটা কী?'

'ঐ যে বললাম, ডিজাইন।'

'মিথ্যে কথা বলবেন না। বলুন কী জন্যে এসেছেন?'

'অনু রায়ের সঙ্গে দেখা করতে।'

'দরকারটা কীসের?'

'কীসের—মানে ঐ ইয়ে—'

'বলা যাবে না? ঠিক আছে, আপনার নাম আর ঠিকানা রেখে যান। কাল সকালে আসবেন। থাকতে বলে দেবো।'

'সেই ভাল—আমি কাল সকালেই আসব। আর লেখালিখির কী দরকার? আচ্ছা, মিসেস রায় এত সুন্দর একটা মূর্তির বুকে মুখে এত বিশ্রী সব দাগ কিসের বলতে পারেন?'

মহিলা প্রায় কটমট করে নীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানিনা। তাছাড়া আপনার এতসব জানার কী দরকার?'

ম্লান হেসে নীল বলল, 'না। এমনিই জিজ্ঞাসা করলাম। শিল্পকর্ম নষ্ট হচ্ছে দেখলে কারই বা ভালো লাগে বলুন।'

নীল বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎ মহিলা প্রশ্ন করেন, 'আপনার নাম?'

'নির্মল সিংহ।'

মহিলা যেন হঠাৎই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন: প্রায় চমক লাগা কণ্ঠেই বললেন, 'কী নাম বললেন? নির্মল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠাকুর্দার দেওয়া নাম। আচ্ছা চলি, নমস্কার।'

'দাঁড়ান। একটু আগে যে লাল রঙের ডায়েরিটা ব্যাগে পুরেছেন, ওটা টেবিলে রেখে যান।'

অগত্যা। নীল ক্যাবলা ক্যাবলা হাসি হেসে সাইডব্যাগ থেকে ডায়েরিটা বার করে টেবিলে রেখে বেরিয়ে আসে।

বাড়ি যখন ফিরল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। কিন্তু ওর মুখচোখে এক অদ্ভুত প্রসন্নতা ছড়িয়ে আছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, যে জটিল রহস্যময় অস্থিরতা ওকে পাগল করে তুলেছিল, ও যেন তার সমাধানের কাছে চলে এসেছে। অনু রায়ের বাড়ি থেকে যে ফটোটা নিয়ে এসেছিল অনেকক্ষণ ধরে উল্টেপাল্টে সেটা

দেখল। ছেঁড়া নাইলন মোজাটাও গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করল। তারপর ঘাড় নাড়তে নাড়তে নিজের মনেই বিড়বিড় করল, 'কার সাধ্য ধরে। কিন্তু এখনও যে অনেক কাজ বাকী।'

হঠাৎ কী মনে হতে ও বিকাশ তালুকদারকে ফোন করল। সৌভাগ্যবশত তালুকদার তখন বাসাতেই ছিলেন। গলার আওয়াজ শুনেই বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো মশাই। কোথায় অ্যাদ্দিন ডুব দিয়েছিলেন? আপনাকে তো ফোন করে করে হদ্দ হয়ে গেলাম।'

নীল মৃদু হাসল। তারপর বলল, 'নির্মলের খুনীকে ধরতে চান? অন্তত সাত নম্বর নির্মল খুন হবার আগেই—'

বিকাশ বললেন, 'ফের ঠাট্টা করছেন? পুলিশের এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। চারিদিকে অপদার্থ আর অকেজো এইসব বিশেষণ শুনতে শুনতে নিজের গালে নিজেরই চড় মারতে ইচ্ছে করছে। তা খুঁজে পেয়েছেন মালটিকে?'

'ঠিক যাকে খুঁজে পাওয়া বলে তা নয়। তবে তাকে পেতে গেলে যা যা করার দরকার সেগুলো করছি। আশা করছি বাছাধনকে এবার আমার ফাঁদে পা দিতেই হবে। আসলে একটা টোপ। যাকে বলে চার ফেলা। মনে হচ্ছে অতল জলের মাছটি এবার ধরা দেবেই।'

তালুকদার যেন উৎসাহে ফেটে পড়তে চাইলেন, বললেন, 'আমি জানতুম, আপনিই পারবেন। তা কোথায় পেলেন? কী ভাবে পেলেন?'

'সেসব অনেক কথা। পরে বলব। এখন মন দিয়ে শুনুন, আগামী শনিবার সন্ধ্যে ঠিক সাতটার সময় একদম রেডি থাকবেন। অ্যাঁ, কী বললেন? হ্যাঁ, জিপ তো থাকবেই—সঙ্গে গোটা দুই আর্মড কনস্টেবল।'

'কাউন্টার অ্যাটাকের ব্যাপার স্যাপার আছে নাকি?'

'তেমন কিছু নয়, তবে একটু এদিক-সেদিক হলেই সাত নম্বর নির্মলের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। খুনীর হাতে টিপ কিন্তু মারাত্মক।'

'আর কিছু বলবেন না?'

'না, কেননা এখন আমার চার ছড়াতে হবে। খুনীর হাতে শুধু টিপ নয়—অত্যন্ত চালাক সে। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা—এর মধ্যে প্ল্যান যদি কিছু পাল্টায় ফোনে জানিয়ে দেবো।'

ফোন নামিয়ে রেখে ও চুপচাপ ওর সোফায় বসে রইল। একমনে সিগারেট টানল। তাকিয়ে রইল ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানটার দিকে।

পরের দুটো দিন ও ভীষণভাবে ব্যস্ত রইল নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি নিয়ে।

এর মধ্যে বারদুয়েক গেল নির্মল সান্যালের বাড়ি। পাখি পড়ানোর মত তাকে অনেক কিছু পড়াল। দিল অনেক উপদেশ। আলোচনা করল নানান বিষয়ে। তারপর অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করল সেই বিশেষ শনিবারের সন্ধ্যার জন্যে

খিদিরপুর অঞ্চলের প্রায় নির্জন জাহাজঘাটা। যদিও আকাশে চাঁদের আলো, দূরে কর্পোরেশনের বিজলী স্তম্ভ, তবু ছায়া-ছায়া নির্জনতাও আছে। জাহাজঘাটার রেলিং-এর ধারে এক যুবক-যুবতী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠবদ্ধ। নিবিড়ভাবে পরস্পর পরস্পরকে ঘিরে রেখেছে। দুজনের চোখে স্বপ্ন মনে ভাবের রঙ। মুখে আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি। সাধারণত মেয়েদের তুলনায় প্রেমের ক্ষেত্রে ছেলেদের আবেগ থাকে বেশী। এমনি আবেগ নিয়েই ছেলেটি ডাকে, 'রাধা!'

'উঁ।'

'কিছু বলছ না তো?'

'কী বলব?'

'আমাদের কথা। তোমার কথা—আমার কথা।'

'সেসব কথা তো কত বার বলা হয়েছে।'

'সেসব কথাই তো বার বার বলতে আর শুনতে ইচ্ছে করে, যা কিছুতেই পুরনো হয় না।'

রাধার দৃষ্টি ছিল রাত্রির প্রতিবিম্ব পড়া জলের বুকে। তেমনি ভাবেই সে বলে, 'তুমি কিন্তু বেশ রোমান্টিক।'

শব্দ করে হেসে ওঠে ছেলেটি। তারপর বলে, 'রোমান্স করার সময় রোমান্টিক হব না?'

'হুঁ'। বলে রাধা চুপ করে যায়। আবার কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা ফিরে আসে। আধা আলো আধা আঁধারের নিজস্ব একটা মোহ আছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিবিড় করে তোলে। ছেলেটি আরো গভীর আবেগে ঘনিষ্ঠতার দূরত্ব কমাতে কমাতে বলে, 'তোমায় একটা কথা বলব রাধা?'

'আমরা তো এখন দিনের পর দিন শুধু কথাই বলি। বল কী বলবে?'

'কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি, তুমি যেন কেমন অন্যমনস্ক। যেন গভীর কিছু নিয়ে ভাবছ। এত কী ভাবো রাধা?'

'কই, কিছু না তো।'

'এই তোমার আর এক দোষ। দেখছি ভাবছ, অথচ কিছুতেই বলবে না যে তুমি ভাবছ।'

রাধা হেসে ফেলে। নিজেকে একটু আলগা করে নিয়ে ওর দিকে তাকায়। তারপর বলে, 'তুমি তো কবি। আচ্ছা তুমিই বল, এমন একটা নির্জন পরিবেশে কথা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না? এখন কথা না বললেই তো অনেক কথা বলা হয়ে যায়।'

'আসলে তুমি এড়াতে চাইছ।'

'না না, এড়াচ্ছি না। আসলে আমি বড় সাত পাঁচ ভাবি তাই হয়ত অন্যমনস্ক মনে হয়। ও কিছু না।'

'কী ভাব? এত কী তোমার ভাবার আছে?'

'আছে মশাই আছে। পরে সব বলব।'

'পরেটা কবে আসবে?'

'আসবে, আসবে।'

'না, সেই পরেটা আসার কোন চেষ্টাই তোমার নেই।'

'মানে?'

'মানেটা কী আবার মনে করিয়ে দিতে হবে!'

'বুঝেছি। বিয়ের কথা বলবে তো? এত তাড়া কেন? আমি কী পালিয়ে যাচ্ছি?'

'আরে বাবা পালানোর কথা হচ্ছে না। প্রথমত মা তাড়া দিচ্ছেন।'

'মা না তুমি?'

'ধরো আমিই। তা সেটা কী দোষের?'

রাধা সহসা এ প্রশ্নের জবাব দেয় না। ফের সে গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকে।

'কই কিছু বললে না তো?'

রাধা তবু নিরুত্তর।

'রাধা?'

'উঁ।'

'আজ কিন্তু আমি তোমার কাছে ফাইন্যাল কথা শুনতে চাই।'

'ফাইন্যাল কথা? মানে শেষ কথা?'

'না শুরুর কথা।'

রাধা আবার চুপ করে। তারপর একসময় ধীরে ধীরে বলে, 'আমাকে

আজকের রাতটা ভাবতে দাও।

'এখনও ভাবতে হবে ?'

'হবে না ! সারাজীবনের ব্যাপার ! বাড়িতেও কিছু জানানো হয়নি।'

'বাড়িতে তোমার কথাই তো শেষ কথা।'

'তা ঠিক—তবে—'

রাধা আবার চুপ করে যায়। ছেলেটিও আর কিছু বলে না। ধীরে ধীরে সে রাধার কাছ থেকে নিজেকে সামান্য তফাতে সরিয়ে নিয়ে যায়। একটা সিগারেট ধরায়। তারপর একমনে নিঃশব্দে সিগারেট টেনে চলে। রাধা আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ায়। ওর একটা হাত টেনে নেয়, তারপর বলে, 'রাগ ?'

যুবকটি মুখ ফিরিয়ে বলে, 'না।'

'হ্যাঁ, রাগ। আমি বুঝতে পারি।'

'না, তুমি বুঝতে পার না। পারছও না। তুমি বুঝতে চাইছ না যে এর ওপর আমার ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা। মাত্র তো একটা রাত। তারপর কাল ভোরেই আমার ফোন পাবে—'

'সিওর ?'

'সিওর, সিওর, সিওর।'

'কিন্তু সিওরটা কী ?'

'সেটা কাল সকালের জন্যেই উহ্য থাক। প্লীজ, আমার এই অনুরোধটা রাখ। এ ব্যাপারে এই মুহূর্তে আর তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কোর না। এবার আমার একটা কথা রাখবে ? অনেক দিন তোমার কবিতা শুনিনি। তোমার গলায় তোমার কবিতা আমার খুব ভালো লাগে। শোনাবে ?'

যুবকটি নির্নিমেষ কয়েক পলক রাধার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একটি কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে। আবেগে তার মুখ ফিরে যায় গঙ্গার দিকে। রেলিংয়ের ধারে চলে গিয়ে ভরাট উদাত্ত কণ্ঠে সমস্ত পরিবেশটাকে যেন অন্যরকম করে তোলে। ইত্যবসরে রাধা যেন কখন বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেছে। যুবকটির কিন্তু তখন রাধার কথা মনে নেই।

রাধার কাঁধে ছিল ঝুলনো লেডিজ ব্যাগ। কবিতা শুনতে শুনতে তার হাত চলে যায় ব্যাগের মধ্যে। এক সময় ধীরে ধীরে হাতটি বেরিয়ে আসে ব্যাগের বাইরে। হাতের মুঠোয় ধরা একটি লেডিজ মোজার একপ্রান্ত। অন্য প্রান্তে অর্থাৎ নিচের দিকে ঝুলছে ভারি কিছু। মোজাটি ধীরে ধীরে সে দোলাতে থাকে।

তারপর এক সময় তার হাত দোদুল্যমান মোজাটিকে দুটি পাক খাইয়েই চকিতে ওপরে তোলে—তার লক্ষ্যস্থল যুবকটির কপালের একপাশ। কিন্তু, দোদুল্যমান অস্ত্রটি লক্ষ্যস্থল পৌঁছনোর আগেই দুটি আওয়াজ ওঠে নির্জনতা ভঙ্গ করে, গুড়ুম··· গুড়ুম। পরক্ষণেই আর্ত-চিৎকারে লুটিয়ে পড়ে রাধা মাটিতে।

অনতিদূর থেকে ছুটে আসে চারজন মানুষ। তাদের দুজনের হাতে উদ্যত পিস্তল। কাছে এলে বোঝা যায় তাঁরা হচ্ছেন নীল ব্যানার্জি, বিকাশ তালুকদার এবং দুজন কনস্টেবল। বিকাশ সর্বাগ্রে পৌঁছে যান রাধার কাছে। দুটি গুলিই তার দেহ বিদ্ধ করেছে। কিন্তু সে মরেনি। একটি লেগেছে হাতে অন্যটি পাঁজরার নিচে। বিকাশ তার পাল্‌স দেখেন। চটপট তিনি একজন কনস্টেবলকে ডকইয়ার্ড থেকে হসপিটালে ফোন করতে পাঠান।

নীল ততক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে রেলিংয়ের ধারে যেখানে তখনও যুবকটি রেলিং-এ ভর দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নীল ধীরে ধীরে তার কাঁধে হাত রাখে। তারপর বলে, 'সরি নির্মলবাবু, একস্ট্রিমলি সরি। এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। তবে আপনার নিখুঁত অভিনয়ের জন্যে ধন্যবাদ।'

কিছু না বলে নির্মল এগিয়ে আসে রাধার ভূপতিত দেহটির কাছে। তার চোখে তখন জলের আভাস। আস্তে আস্তে সে রাধার কাছে বসে পড়ে। তুলে নেয় তার একটা হাত।

রাধার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু সে বলে, 'অভিনয় ?'

নির্মল ওর হাতে সামান্য চাপ দেয়। তারপর ধরা গলায় বলে, 'না, সবটা নয়।'

রাধার অবস্থা ভালো নয়। হসপিট্যালের বেডে সে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝছে। অধিক রক্তক্ষরণে তার দেহ এবং প্রাণশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। রাধার সামনে নীল আর বিকাশ তালুকদার। পাশেই রয়েছে টেপ রেকর্ডার। সেটা চলছে। নীলকে বলতে শোনা যায়, 'চরণচিহ্ন'-র প্রচ্ছদশিল্পী অনু রায়—মানে অনুরাধা রায়, তাইতো ?' রাধার মুখ ফেরাতেও কষ্ট হচ্ছিল। তবু সেই ভাবেই, অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে সে বলল, 'আমি জানতাম, এমন একটা দিনের প্রতীক্ষায় ছিলাম অনেক দিন থেকেই। আপনিই তো আমার বাড়ি গিয়েছিলেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেন, কেন এত নির্মল খুন মিস রায়?'

অনুরাধা এ কথার জবাবে কেবল কষ্টের একটি স্মিত হাসি হাসে, যে হাসি অবজ্ঞার, যে হাসি বিতৃষ্ণার, যে হাসি প্রতিশোধের। তারপর সামান্য কিছু সময় নেয়, কারণ কথা বলতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কোন রকমে এক সময় বলে, 'সে যে অনেক কথা, আর তো আমি অত কথা বলতে পারব না। আমার ড্রয়ারে একটা লাল রঙের ডায়েরি আছে, সব—সব কিছু তাতে লেখা আছে। আমি মরার পর পড়ে নেবেন।'

আবার সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলে, 'আমি মরার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। আমার কোন দুঃখ নেই। কেবল মায়ের কথা বড় মনে হচ্ছে। কী করে যে তাঁর দিন কাটবে—তাঁর তো আর কেউ রইল না।'

'মিস রায়, আর কিছু বলবেন না?'

'সব নির্মলদের জন্যেই আমার বড় কষ্ট। আসলে এক নির্মলকে খোঁজার কারণেই যে এত নির্মল খুন।'

অনুরাধা এর পরেই জ্ঞান হারালো। এবং সেই দিন রাত্রেই তাকে বিদায় নিতে হল চিরদিনের জন্য—পৃথিবী থেকে।

পুলিশের তরফ থেকে বিকাশ তালুকদারই অনুরাধার লাল ডায়েরিখানা উদ্ধার করে। অনুরাধার মা কিন্তু কোন প্রতিবাদই করেননি। বড় আশ্চর্যের তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে কেউ এক ফোঁটা জলও দেখেনি তাঁর চোখে।

লাল ডায়েরিতে অনুরাধা তার জীবনের সব কথাই লিখে গিয়েছিল। বিকাশ তালুকদার নীলের হাতে ডায়েরীটা তুলে দিয়ে বললেন, 'মিঃ ব্যানার্জি, ডায়েরীটা আপনিই পড়ুন। এঁরা সবাই মানে মিঃ বরাট, মিঃ খান্না, মিঃ বিশ্বাস মানে যে সমস্ত অফিসাররা নির্মল-খুনে গলদঘর্ম তাঁরা শেষটা জানতে ব্যগ্র। আর সত্যি কথা বলতে কী এ রহস্য সমাধান তো আপনিই করেছেন—আপনিই সব বলুন।'

ডায়েরী হাতে নিয়ে নীল বলল, 'আপনি বলছেন, আমি পড়ছি। তবে পড়ার আগে বলি, ডায়েরিটা আমি আগেই পেয়েছিলাম। তবে নিয়ে আসার সুযোগ হয়নি। কেবল আনতে পেরেছিলাম নাইলন লেডিস সক্স আর এই ছবিটা', বলে ও পকেট থেকে এক পাটি মোজা আর একটা কালার্ড পোস্টকার্ড সাইজের ছবি বার করে। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েন ছবির ওপর। অনুরাধা এবং আর একটি উজ্জ্বল সুন্দর দর্শন যুবকের হাস্যরত ছবি।

মিঃ বরাট বললেন, 'একজনকে তো চিনলাম, কিন্তু ছেলেটি কে?'

'চপল। যে চপলের জন্যে এত খুন। চপল মিত্র। অনুরাধা রায়ের

ভালবাসার মানুষ।'

'আই সী', মিঃ বরাট বললেন, 'তার মানে এত খুন সব প্রেমের জন্যে?'

'হ্যাঁ, প্রেম তো বটেই।'

'তার মানে এতগুলো নির্মল চপলকে হত্যা করেছিল?'

'না, এইসব নির্মলেরা ছিল অতি নির্মল। আসল কাহিনীটা পাওয়া যাবে ডায়েরীতে। তবে অনুরাধাই যে খুনী তার প্রমাণ ঐ ছবিটা উল্টে দেখুন। কবে কোন্ নির্মলকে ও খুন করেছিল তার তারিখ পর্যন্ত লেখা আছে।

সবাই দেখলেন। তারপর বিকাশ বললেন, 'এবার তাহলে ডায়েরিটা পড়ুন।'

নীল পড়া শুরু করে,

'চপল আর আমি দুজনেই ছিলাম আর্ট কলেজের ছাত্র। ও ছিল আমার থেকে দু বছরের সিনিয়ার। দারুণ আঁকত ও। ওর আঁকার হাতটি ছিল অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু। ওর তুলির টানই আমাকে ওর কাছে নিয়ে যায়। তারপর একদিন আমি ওকে ভালবেসে ফেললুম। এবং চপলও। দুজনে সেদিন ঠিক করেছিলুম একটা ঘর বাঁধব। সে ঘর হবে দুজনের।

'কিন্তু ঘর আমাদের বাঁধা হল না। মাঝে এসে দাঁড়ালো নির্মল। নির্মল মুখার্জি। ও ছিল চপলের বন্ধু। চপলই একদিন নির্মলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়। পরে আমি বহুবার ভেবেছি চপলের মত ছেলের বন্ধু হয় কী করে নির্মলের মত ছেলেরা। আইরনি অব ফেট বা ভাগ্যের পরিহাস—চপল, যার নামের মধ্যে রয়েছে চঞ্চলতার আভাস, সে ছিল তার ব্যবহারে অমায়িক, শান্ত, উদাসীন এবং পুরোমাত্রায় শিল্পী। আর নির্মল? মদ্যপ, প্রতারক, দুর্দান্ত। তার চরিত্রের কোথাও নির্মলতার কোন চিহ্নই ছিল না। মাঝে মাঝে চপলকে আমি অনুযোগ করতাম নির্মলের সঙ্গ ত্যাগ করার জন্যে। ও হেসে উড়িয়ে দিত। চপলকে আমি অনেকবারই বলেছিলাম আমার প্রতি নির্মলের অশালীন ব্যবহার আর গ্রাম্য রসিকতার কথা। নির্মলের চোখে আমি দেখেছিলাম কামনা আর বাসনার ক্ষুধা। ও দৃষ্টি আমার মোটেও ভাল লাগত না। পারতপক্ষে আমি ওকে এড়িয়েই চলতাম।

'কিন্তু আমার না চাওয়াটাকে নির্মল পাত্তাই দিত না। ও আমাকে বিরক্ত করত। এমন কি মাঝে মাঝে মদ্যপ হয়ে ও আমার হাত ধরে টানাটানি করতেও দ্বিধাবোধ করত না। একদিনের কথা মনে আছে, সেদিন চপল কলেজ যায়নি। বৃষ্টিও পড়ছিল। একা একা প্রায় নির্জন রাস্তা দিয়ে আমি বাড়ি

ফিরছিলাম। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে নির্মল এসে সামনে দাঁড়াল। একেবারে আমার শরীরের সামনে, তারপর বলল, 'কোথায় যাচ্ছ অনু...হন্তদন্ত হয়ে... চপলের খোঁজে?'

বিরক্ত হয়েই বলেছিলাম, 'সে খোঁজে তোমার কী?'

'আছে, আছে। আমি ঠিক করে ফেলেছি, তোমার খোঁজ এখন থেকে আমারই রাখা উচিত।'

'তার মানে?'

'যথেষ্ট বয়েস হয়েছে এ কথার মানে বোঝার।'

'নির্মল, তুমি বেশ ভালো করেই জান, আমি চপলকে ভালবাসি। তোমার আমার আলাপের সূত্র সেটাই। তুমি আমার কথা না ভাবলেই আমি সুখী হব।'

'কিন্তু আমি তো সুখী হব না। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি যে সুখী হতে চাই না।'

'অসভ্যতা কোরো না নির্মল। যা হয় না তুমি তাই ভাবছ। মনে রেখো জোর করে অনেক কিছু হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু একটি মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যায় না।'

নির্মল মাছি ওড়ানোর মত আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'পায়, অন্তত আমি যা চাই, তাই পাই।'

বলেই ও আমার হাত দুটো চেপে ধরেছিল। ওর মুখে মদের বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছিল তখন।

এক ঝটকায় খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, 'রাস্তায় সীন্ করো না। হাত ছাড়ো।'

'তার আগে চপলকে তোমায় ছাড়তে হবে।'

'এটা ঠিক মধ্যযুগীয় বর্বরতা হচ্ছে নাকি?'

'লেকচার দিও না, তোমাকে আমি পাচ্ছি—এটাই আমার ডিসিশান।'

'চপল তোমার বন্ধু।'

'গুলি মারো, বন্ধুকৃত্যটা চপলকেই করতে বোলো। আমি চাই না এর পর তোমাকে চপলের পাশে দেখতে।'

সেদিন নির্মল হাত ছেড়ে দিয়েছিল। পাশ কাটাবার আগে ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'দেখতে পেলে?'

নির্মল সে কথার কোন জবাব দেয়নি। কেবল চোখের ঘৃণিত হিংসা ছড়িয়ে অদ্ভুত রহস্যময় হাসি হেসেছিল। যদিও নির্মলের কথায় আমি কোন গুরুত্ব দিইনি

তবু একদিন ক্লাসের পরে দুজনে এসে গাছতলায় বসেছিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যের মুখ। আসলে ওর সঙ্গে নিরিবিলিতে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম। তার প্রতি নির্মলের হিংসা আর বীভৎস চরিত্রের কথা সব খুলে বলব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। হঠাৎ দূরে তাকিয়ে দেখলাম কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে নির্মল আমাদের দিকেই আসছে। ওর আসার ভঙ্গী দেখেই বুঝেছিলাম ও তখন মত্ত এবং উদ্দাম। চপলকে নিয়ে আমি উঠে আসতেই চেয়েছিলাম। এবং চপলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন আমরা উঠে পড়েছি, তখনই নির্মল এবং ওর বন্ধুরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। নির্মলই এগিয়ে এসে বলে, 'জানো অনুরাধা, নির্মলের কথা না শোনার পরিণাম কী? চলে এসো আমার সঙ্গে।'

খানিকটা আশ্চর্য হয়ে চপল এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'এসব তুই কী বলছিস নির্মল?'

'সামনে থেকে সরে যা চপল, অনুরাধা তোর কেনা বাঁদী নয়।'

'তার মানে?'

'মানে অনুরাধাকে আমার দরকার। তুই এখন যা।'

বলেই নির্মল খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরে বলেছিল, 'চলো।'

যে চপলকে আমি কোন দিনও রাগতে দেখিনি, কারো সঙ্গে কোন বিবাদ করতে দেখিনি, সেদিন দেখেছিলাম একজন নিরীহ মানুষের রাগ। এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিয়ে ঠাস্ করে নির্মলের গালে একটা চড় কষিয়ে বলেছিল, 'ইতর কোথাকার, এটা কী গুণ্ডামির জায়গা? জানিস না মেয়েদের কী ভাবে সম্মান দিতে হয়?'

হা ঈশ্বর, তারপরই ঘটে গেল সেই বীভৎস ঘটনাটা। নির্মল নিজের গালে দুবার হাত বোলালো। তারপর তার দৃষ্টিটা সরাসরি ফেলল চপলের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর শব্দহীন হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে। মাত্র কয়েক লহমা। তারপর তার হাত চলে যায় হিপপকেটে। টেনে বার করে একটা লেডিস লম্বা সক্স। নাইলন সক্স। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয় বাঁ দিকের সঙ্গীর দিকে। সঙ্গীটি বেশ বড় মাপের একটি পেপারওয়েট তুলে দেয় নির্মলের হাতে। নির্মল সেটি মোজার মধ্যে ভরে নেয়। তারপর ভয়ঙ্কর বীভৎসতা নিয়ে মোজাটি দোলাতে দোলাতে বলে, 'নির্মল মুখার্জির বাপও কোনদিন তার ছেলের গালে চড় মারেনি। এখনও বলছি তুই চলে যা—'

আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। কিছু অঘটন ঘটার আগেই চপলকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। চপলের হাত শক্ত করে ধরে বলে-

ছিলাম, 'চল চপল।

'না,' বলেই তার হাতের জ্বলন্ত অস্ত্রটি ঘুরিয়ে সজোরে আঘাত করেছিল চপলের রগে·· একবার নয়, ত্বার, তিনবার—যতক্ষণ না জ্ঞান হারিয়ে চপল মাটিতে পড়ে যায়।

এরপর খানিকটা জায়গায় কিছু লেখা ছিল না। তারপরে মাত্র কয়েকটা কথাই লেখা ছিল, 'চপলের মৃতদেহে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নির্মলকে নিজের হাতে শাস্তি দোব—ঐ একই অস্ত্র দিয়ে—কিন্তু নির্মলকে আর পাইনি··· কোথাও খুঁজে পাইনি, যে নির্মলদের পেয়েছি তারা কেউ সেই নির্মল নয়—। তোমরা, নির্মলেরা, পার যদি আমায় ক্ষমা কোরো।'

এর পরের পাতা সব সাদা। নীলও ওর পড়া শেষ করে ডায়েরীটা এগিয়ে দিল বিকাশ তালুকদারের সামনে।

প্রত্যেকেই তখন চুপ। নৈঃশব্দ ভঙ্গ করলেন মিঃ খান্না। বললেন, 'এ তো এক ধরনের ইনস্যানিটি। সি ওয়াজ আ সাইকিক পেসেণ্ট।'

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, 'ঠিক তাই। চোখের সামনে প্রেমিকের শোচনীয় মৃত্যু ওর স্যানিটি নষ্ট করে দিয়েছিল। ওর মায়ের মুখেই পরে শুনেছি, চপলের মৃত্যুর পর অনুরাধার জীবনটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। হয়ে পড়েছিল অসুস্থ। নিজেকে আর নিজের ত্বঃখ ভুলতে ও ক্রমশ নেশার দাস হয়ে পড়ে। সিগারেট, মদ এসব তো ওর নিত্যসঙ্গী। আসল নির্মলকে খুঁজে না পেয়ে ও নির্মল নামের ছেলেদের সঙ্গে যেচে আলাপ করত। করত প্রেমের অভিনয়। তারপর সুযোগ মত একই কায়দায় হত্যা করত যেমন করে চপলকে একদিন হত্যা করেছিল নির্মল মুখার্জি।'

তালুকদার চুপ করেছিলেন অনেকক্ষণ। নীল থামতেই প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, অনুরাধার মা কী জানতেন নির্মল খুনের ব্যাপারগুলো।'

'বোধহয় জানতেন। কারণ ত্বটো। আমাকে প্রথম দিন নাম জিজ্ঞাসা করায় যখন উনি শুনলেন আমার নাম নির্মল সিংহ– তখন ওঁকে আমি চমকে উঠতে দেখেছিলাম। আর দ্বিতীয় কারণ হল, ঐ প্রসেসে মানুষ খুন করতে হলে প্রচণ্ড টিপ দরকার। অনুরাধা সেই টিপ প্র্যাকটিস করতেন নিজের ঘরে। একটি কালোরঙের ব্রোঞ্জ মূর্তির রগ টিপ করে উনি নিয়মিত সাধনা করতেন··· এমন কি নেশাসক্ত অবস্থাতেও যাতে লক্ষ্যবস্তু না ফসকায়। ফলে, সেটি ওর মায়ের জানা হয়ে যায়। যদিও ওর মা তা অস্বীকার করেছিলেন ··

'গ্যাড, ভেরী গ্যাড। আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, আমার আর একটা প্রশ্ন আছে,

অনুরাধাকে আপনি খুঁজে পেলেন কী করে ?'

নীল হাসল। তারপর বলল, 'এ ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট ওটাই। বলতে পারেন খানিকটা কাকতালীয় ব্যাপার—এই দেখুন।'

বলে ও টেবিলের ওপর মেলে দিল দুটি বস্তু।

একটি কবিতার বই। বইয়ের নাম 'চরণচিহ্ন'।

দ্বিতীয়টি অনুরাধার লেখা চিরকুট, 'চপলের হত্যাকারী'।

তারপর বলল, 'ভালো করে দেখুন, তিনটে 'চ'এর স্টাইল অব লেটারিং হুবহু এক।'

———